জন নাগার্জ্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটতন্ত্র ও রসরত্নাকর * প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ।

নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইলে, পারদের জরা-ব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক সূত্রাদিকার নাগার্জ্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্য্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিবার হেতুও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে "সুভূতি গৌতমের" উল্লেখ প্রভৃতি দুই একটী এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জ্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জকাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত-সংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(খ) সংগ্রহকার।

বাগ্‌ভট—ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ বা 'বৃদ্ধ বাগভট' এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা 'বাগ্‌ভট' রচনা করিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য্য বলিয়া বাগভটকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইৎসিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় বাগভট ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগভট সিন্ধু (Sind) দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগভট পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন ; কারণ উভয় গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কুত্রাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম পর্য্যন্ত এক। সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগভটের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগভট সংগ্রহকার বাগভট হইতে পৃথক ব্যক্তি এবং বহু পরবর্ত্তী। কারণ বিস্তৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহে রসতন্ত্রোক্ত বিষয়ের নামগন্ধও নাই। এতদ্ব্যতীত সোমদেব গোবিন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর—মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ 'রুগ্বিনিশ্চয়' গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর বঙ্গ-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগভটের বচন উদ্ধৃত

* রসরত্নাকর নামে দুইখানি রসগ্রন্থ আছে—একখানি নাগার্জ্জুন কৃত ও অপরখানি নিত্যনাথ কৃত। রসগ্রন্থ প্রসঙ্গ দেখ।

করায় বুঝা যায় যে, মাধবকর বাগভটের পরবর্ত্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব, বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট 'হরুণ-উল-রসীদের' রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, মাধবকর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান ব্যতীত মাধবকর "রত্নমালা" নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডল্লনের কথিত সুশ্রুতে টিপ্পনীকার 'শ্রীমাধব' মাধবকর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধবকর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নিদানকার মাধবকর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধবকর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য্য মাধবকরের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল—ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়লনিঘণ্ট নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক বম্বে হইতে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার" মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়লনিঘণ্টু নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সোঢ়ল গুর্জ্জর দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাত্রেয়, অগ্নিবেশ, বৈদেহ প্রভৃতির অনেক পাঠ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবনিদানের সহিত ইহাঁর গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধবকরের কিছু পূর্ব্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্ভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগ্ভটের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ—সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ, মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপ কালীন। ইহাঁর পিতা গৌড়াধিপ নয়পালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সুশ্রুতের টীকা, "চক্রদত্ত" নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে,নয়পালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শাঙ্গর্ধর—ইনি শাঙ্গর্ধর পদ্ধতি, শাঙ্গর্ধর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, কবি ও আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহকার। শাঙ্গর্ধরপদ্ধতির প্রস্তাবনায় জানা যায় যে, ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন—ইহাঁর রচিত চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ "বঙ্গসেন" নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, লুপ্তপ্রায় অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া তিনি "বঙ্গসেন নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শাঙ্গর্ধরের পরে এবং ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া-

ছিলেন। ইঁহার বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

ভাবমিশ্র—ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোর্টুগিজদিগের দ্বারা ভারতীয় পণ্যাঙ্গনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোর্টুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে, ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(গ) টীকাকারগণ।

ডল্লন—সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "পাল দেব" নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গৌড় ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন ও চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজন্য উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি—চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি সুশ্রুতের "ভানুমতী" এবং চরকের "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় সংগ্রহকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অরুণদত্ত—বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত ছিলেন।

বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত—মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "আতঙ্কদর্পণ" নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয়রক্ষিত গুণাকর প্রণীত "যোগরত্নমালা" হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, তিনি গুণাকরের পরবর্ত্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিজয়রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে প্রমেহনিদান হইতে মাধবনিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শিবদাস—চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গৌড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের অন্যান্য টীকাকার—**ঈশান দেব, হরিচন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড ও গুণাকর** প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন দুর্লভ।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি **গঙ্গাধর** ও চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকা এবং কয়েক খানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার—**জৈয়ট বা জেজ্জড, কার্ত্তিক, গোমী, গদাধর ও গয়ী বা গয়দাস** প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত **ভাস্কর** সুশ্রুতের পঞ্জিকা এবং **মাধব, ব্রহ্মদেব ও**

সোম টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভটের অন্যান্য টীকাকার—অরুণ দত্ত ব্যতীত চন্দ্রনন্দন ও হেমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দু প্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ প্রবন্ধ লেখকের নিকট বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ।)

দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।

—:*:—

ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া কুটীর রচনা করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঁশ ঘুণের কবলে ঝাঁঝ্‌রা হইয়া পড়ে। আর যদি সেই বাঁশ জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে তাতাইয়া দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা যায়, তবে সেটি বহু দিন স্থায়ী হয়। ঘুণ তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। যে চাষার ছেলে মাঠের মাঝে আকাশের বারিধারা ও সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড কিরণ মালা বরণ করিয়া আপনাকে গড়িয়া তোলে, ঘুণের মত রোগ-বীজাণুও তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না, জরাও কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহার দেহ-যষ্টিকে আক্রমণ করে না, এজন্য যুবা বয়সে অকাল বৃদ্ধ অথবা পরিণত বয়সে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিবার মত লোক অনেক দেখা যায়। রোগ ও জরার প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিতে হইলে আমাদিগকে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে হইবে। দুইটি বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ব্যাপারে আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। একটি তাপ, অপরটি শৈত্য। এই দু'টি ক্রমে ক্রমে সহাইতে পারিলে মানুষ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে পারে। পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশে নবজাত শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়ার প্রথা ছিল। উহার উদ্দেশ্য মানব শিশুটীকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা। আমরা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাল প্রথা ত্যাগ করিতেছি, আবার অনেক মন্দ প্রথা ক্রমে ক্রমে আমদানী করিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে সামাজিক প্রথা বদ্‌লাইতে কিম্বা নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত।

একদা কোন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কলিকাতার কোন ধনী ভূস্বামীর বাড়ীতে তাঁহার পুত্র ও জামাতার জররোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। দুই জনের জ্বরই একদিনে বিচ্ছেদ হয়। জর বিচ্ছেদের পরদিন জমিদারের পুত্রটীকে সুজির রুটি ও কচি পাঁঠার ঝোল এবং জামাতাটিকে খৈ ও বেগুণ পোড়ার ব্যবস্থা করেন। তা'র পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া শোনেন,—জামাতা বাবাজী তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা-বৈষম্যে বিষম রাগান্বিত

হইয়াছেন। তিনি আর হাত দেখাইবেন না। ইহা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় জামাতার কাছে গিয়া স্নেহগর্ভস্বরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী, রাগ করিও না শোন ; তুমি, আমি, (কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া) এঁরা সব ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, শুক্তো, ডালনা, একটু দুধ খাইয়াই পুরুষানুক্রমে মানুষ। আমাদের পক্ষে জরান্তে লঘু ভোজন, খৈ আর বেগুন পোড়াই ঠিক। আর উনি পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছেন ; পোলোয়া, কালিয়া, কোরমা, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি খাইয়া মানুষ। উঁহার পক্ষে সুজির রুটী ও কচি পাঁঠার ঝোলই লঘু পথ্য। ধাতু বৈষম্য ত আর বিনা কারণে হয় না। শুনিয়া বাবাজীবন অধোবদনে রহিলেন, আর সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবে উল্লিখিত কবিরাজ মহাশয় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিতেন। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের নাই, এজন্য চিকিৎসকে চিকিৎসকে এত প্রভেদ। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একান্ত রক্ষণশীল এবং বিলাত প্রত্যাগতেরা একান্ত অনুকরণশীল হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় আচার ও অনাচার উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া প্রথা ও 'ফেশান' রূপে সমাজের মধ্যে চলিতেছে।

আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ৭০ বৎসর বয়সে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শূন্য পদে নামাবলী মাত্র গাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। আর তাঁহার যুবক পুত্র বাতায়ন পথে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিলে শয্যাত্যাগ করেন, তৎপর চা খাইয়া গরম কাপড়ের কোট, পোষাকে আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হন।

বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের সর্দ্দি কিম্বা অন্য অসুখ দেখাই যায় না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মুখার্জ্জি সাহেবের সর্দ্দি ত লাগিয়াই আছে, তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়িয়া আমরা শুধু এই বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভান জিনিটা প্রকৃতির চোখে বড় ভয়ানক। ভানে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমি নির্ধন, ধনীর ভানে চলিলে পথের কাঙ্গাল হইতে আমার বিলম্ব হইবে না। শীত নাই যেখানে, সেখানে শীত প্রধান দেশের সাজে চলিলে প্রকৃতির বিচারে স্বাস্থ্যের কাঙ্গাল হইতে বিলম্ব হয় না। এই বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে ৩।৪ মাস একটু শীত বাড়ে, বাঁকী ৮।৯ মাস গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত প্রধান দেশের অনুকরণে সাজ পোষাক কি আহারাদি কিম্বা ভেজষাদি গ্রহণ করিলে ফল বিষময় হইবেই। চিন্তাশক্তির অভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশই গড্ডলিকা স্রোতে চলিয়া থাকেন। মাথার চুল কাটার ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে দেশের বিচার শক্তির বহর বুঝিতে পারা যায়। মাথায় মর্ম্মস্থানের চুল কাটিয়া ছাঁটিয়া শূন্য প্রায় করা হয়, অথচ যাহারা টুপি ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের এই স্থানটি কেশদামে উত্তমরূপ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। হ্যাট ধারীদের সুবিধার অনুকরণে চুল কাটানই টুপীহীন জাতির ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিভাশূন্য অনুকরণশীল জাতির পক্ষে বিশ্বমাঝে জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

—:*:—

[শিশুর খাদ্য]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।]

শিশুকে কি নিয়মে খাওয়াইতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিশুর জন্মকালীন অবস্থা এবং প্রথম কয়েকমাসে তাহার দেহের গঠন ও বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করা যা'ক।

পরিপূর্ণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে একটি সুস্থ শিশুর ওজন প্রায় ৩½ সের থাকে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। প্রথম ৩|৪ দিনের মধ্যে শিশুর ওজন প্রায় একপোয়া কমিয়া যায়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য পাইতে থাকিলে হাড়, মাংস, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ওজনও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বাড়িতে থাকিলে একবৎসরের পর শিশুর ওজন ৯ সের হইতে ১১ সের পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুর ওজন দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। জীবনের আর কোনো সময়ে মানব দেহ এত শীঘ্র বাড়েনা। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময় শিশুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কত প্রয়োজন। দেহ বৃদ্ধি এবং গঠনের জন্য খাদ্য কি অসীম কাজ করে, আমরা ইহা হইতে তাহার ধারণা করিতে পারি। খাদ্য দ্রব্য শিশুকে জড় পিণ্ড হইতে একটী জীবন্ত শিশুতে পরিণত করে। সুতরাং শিশুর জন্য এমন খাদ্য নির্ব্বাচন করিবে—যাহা দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং সহজে হজম হয়। এই সময়ে হাড়, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, ফুসফুস এবং অন্যান্য যন্ত্র এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, প্রত্যেকের সবল গঠন এবং বৃদ্ধির জন্য বহু পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। এই সময়ে কেবল ঘুম এবং আহার গ্রহণ করা ব্যতীত শিশুর দৈহিক কিংবা মানসিক কোন কার্য্যই হয় না। মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্নায়ু, মাংস হাড়, চর্ব্বি প্রভৃতি গঠন এবং বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপাদান। মাতৃদুগ্ধই তাহার দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠন এবং বর্দ্ধনের একমাত্র সহায়। সুস্থ, সবল দেহ গঠন করিতে শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমস্ত উপাদানই আছে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ। ইহাতেই শিশুর যেমন দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠিত হয়, মস্তিষ্ক পুষ্টি লাভ করে, তেমনি মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণা, তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী রমণী আপনার ধর্ম্ম, তেজ, মেধার অঙ্কুর বক্ষের দুগ্ধ ধারা দ্বারাই সন্তানের মনের মধ্যে উপ্ত করিয়া দেন। মাতা মহীয়সী গরীয়সী হইলে সন্তানও মহৎ এবং গরীয়ান হইবেই। কারণ সে যে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মহত্বের বীজ লাভ করিয়াছে। তাহার ফল ত বৃথায় যাইবার নয়। মাতার অন্তরে তেজ, স্বদেশ প্রেম, সাধুতা থাকিলে সন্তানও বীর, স্বদেশ

প্রেমিক ও সাধু হইবেই। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানও মেধাবী হইবে। ইহাই ভগবানের রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে তাহা অন্য কোনো কারণে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিফলতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাই যে সাধারণ নিয়ম এরূপ সিদ্ধান্ত করা নির্ব্বোধের কাজ। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কুটতর্ক জালে নারীর শিক্ষার পথে কাঁটা দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। মাতৃদুগ্ধই শিশুর ভবিষ্যৎ সমস্ত উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। মাতা সাধু, মহৎ, উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধপান করাইবেন। আপনার অন্তরের সমস্ত মহৎ চিন্তা একত্র করিয়া একাগ্রমনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখে আপনার বক্ষের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিবেন। চিত্ত যেন তখন চঞ্চল না থাকে, মন যেন পার্থিব নানা বিষয়ে ঘুরিয়া না বেড়ায়। চিত্ত যেন কোন প্রকার বিক্ষোভের আন্দোলনে আন্দোলিত না হয়। চিত্ত যেন শান্ত প্রফুল্ল এবং সংযত থাকে। চিত্ত যখন দুঃখে, ক্রোধে, ক্ষোভে অশান্ত থাকিবে, তখন শিশুকে কখনও দুগ্ধ পান করাইবেন না। তাহা হইলে ঐ সব দোষ শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হইবে। মাতা শিশুকে যতবার দুগ্ধপান করাইবেন, ততবারই শান্ত সমাহিতচিত্তে তাহা করিবেন। কিন্তু এইরূপ সংযমের সহিত শিশুকে দুগ্ধদান করিতে গেলে নারীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা চাই, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার। নতুবা এইরূপে উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধদানের মর্ম্মই তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, মাতা শিশুকে বক্ষে লইয়া দুগ্ধ দান করিতেছেন, এমন সময় হয় ত আর একটি শিশু আসিয়া কোন কারণে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, আর তিনি ক্রোধ ভরে তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। এই যে মনের বিকৃতি ঘটিল, তাহা বক্ষের দুগ্ধ ধারার সহিত সন্তানের প্রাণে গিয়া মুদ্রিত হইয়া গেল। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাণে যখন শোক কিংবা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সন্তানকে কখনো স্তন্যদান করা কর্ত্তব্য নহে।

যে সকল মেরুদণ্ড বিহীন, ভণ্ডাচারী, অমানুষে দেশ ভরিয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে দেশের নারীজাতি যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে, আত্মার স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, সর্ব্ব-বিষয়ে নারী যতদূর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন সে দিকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই সাধু, বীর, ধর্ম্মপ্রাণ সন্তানের আগমন হইবে। জনক যাজ্ঞবল্ক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, রাজা রামমোহন ও বিদ্যা-সাগরের আগমন বর্ত্তমান অবনতির যুগে এদেশে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে তাঁহারা এই সব যাহা পুরুষ এবং মনস্বিনী নারীর উপযুক্ত জননী হইয়া তাহাদিগকে অমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। নারী তাঁহার বক্ষের অমৃতধারা পান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে

মহত্বের বীজ সন্তানের প্রাণে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন। কবি তাই বলিয়াছেন :—

স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।

যে শিশু শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহার মত দুর্ভাগা এবং যে রমণীর বক্ষে উহার অভাব হয় তাহার মত দুর্ভাগিনী আর নাই। মাতৃদুগ্ধের অভাবে কত শিশু বিকলাঙ্গ চির রুগ্ন, দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীন হইয়া সমাজের হেয় হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ, সুতরাং তাহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা কখনো কর্ত্তব্য নহে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ ঘটিলে শিশুকে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত কৃত্রিম দুগ্ধ (গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধ) দিতে হইবে।

(১) মাতৃদুগ্ধের অল্পতা হইলে অর্থাৎ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলে শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। এ সব স্থলে শিশু পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত স্তন মুখে লয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। শিশুকে এরূপ করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধে তাহার ক্ষুধা যাইতেছে না, আরো খাদ্যের প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপে যাইতে দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশু ক্রমশঃ মিটমিটে, বিবর্ণ এবং রোগা হইয়া যাইতেছে। পুষ্টি এবং খাদ্যের অভাবে এইরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমন স্থলে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত মাতৃদুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট খাদ্য দিতে হইবে। মাতার দুধ অল্প বলিয়া শিশুকে তাহা দেওয়া বন্ধ করিবে না। যতটুকু মাতৃদুগ্ধ শিশু পান করে তাহাই তাহার পক্ষে অমৃতসম হয়।

(২) মাতার দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিলে কিংবা দুগ্ধে অম্ল দোষ অথবা অন্য কোন কারণে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হইলে, তাহা শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ দুধ পান করিলে শিশুর পুষ্টি না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট হয়। এরূপ দুগ্ধ পানের ফলে শিশুর মাংসপেশী শিথিল এবং নরম হইয়া যায় এবং পেটের অসুখ, কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে শিশু অসুস্থ হয়। মাতার দুগ্ধ ঠিক অবস্থায় আছে কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

(৩) মাতা ক্ষয়, যক্ষ্মা, ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত হইলে কিংবা এই ভীষণ অসুখ পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া থাকিলে, তাঁহার দুগ্ধ শিশুকে কখনো দিবে না। এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, মাতৃ দুগ্ধের দ্বারা শিশুর দেহে এই রোগের বীজ রোপিত হইয়াছে।

(৪) মাতা অন্য কোন অসুখে কিংবা রুগ্ন, দুর্ব্বল দেহ বশতঃ কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিতে থাকিলে, তাঁহার দুধ শিশুকে দিবে না। কারণ এইরূপ অবস্থায় মাতার দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয়, সুতরাং শিশুর পক্ষে তাহা একেবারে অনুপযোগী।

(৫) যেখানে মাতার সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়, অর্থাৎ কায়িক শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, সুতরাং শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধদান করিতে

পারেন না, সে সব স্থলেও মাতার দুগ্ধের গুণ ঠিক থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা কর্ত্তব্য নহে।

(৬) মাতার মৃত্যু হইলে কিংবা মাতৃস্তনে কোন পীড়া হইলে শিশুর কৃত্রিম খাদ্য ব্যতীত আর উপায় থাকে না।

উপরোক্ত কারণগুলি বশতঃ শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিতে না পাইলে অনেক স্থলে স্তনদুগ্ধ দিবার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই প্রথা ঘোরতর আপত্তি জনক। ইহাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ যে শ্রেণী হইতে এই সকল ধাত্রী নিযুক্ত হয়, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের কোন সুযোগ হয় না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা বড় হীন। তাহাদের প্রবৃত্তি, মানসিক ভাব এবং নৈতিক আদর্শ ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আবার বংশপরম্পরা গত তাহাদের হৃদয়ে এমন কোন নীচ ভাব নৈতিক হীনতা, বা বুদ্ধি হীনতা বদ্ধমূল থাকিতে পারে--যাহা উচ্চবংশের ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। সুতরাং যে শিশু এইরূপ ধাত্রীর দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয়, তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক হীনতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য কৃত্রিম দুগ্ধ পান করান অপেক্ষা উচ্চবংশ সম্ভূতা, সুশিক্ষিতা, ধর্ম্ম-পরায়ণা স্বাস্থ্যসম্পন্না ধাত্রীর স্তন্যপান করানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এরূপ ধাত্রী পাওয়া কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। শিশুর আত্মীয়ার মধ্যে কেহ ধাত্রীর উপযুক্ত থাকিলে তাঁহার দুগ্ধ পান করানই সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহা না হইলে হীন বংশের, হীন আদর্শে বর্দ্ধিতা ধাত্রীর দুগ্ধ অপেক্ষা গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধে শিশুকে পালন করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি যে সকল কৃত্রিম দুগ্ধ আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর শিশুকে বর্দ্ধিত করা ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। কেবল এই সকল দুগ্ধের উপর শিশুকে পালন করিলে শিশুর মাংসপেশী নরম-থলথলে হয়, হাড় দৃঢ় হয় না, কোন কোন স্থলে হাড় এমন নরম হয়, যে,পা বাকিয়া যায়। মস্তিষ্কের যথেষ্ট পুষ্টি হয় না। সুতরাং শিশু বুদ্ধিহীন হয়। মাতার যতটুকু দুগ্ধ থাকে—ততটুকু পান করান কর্ত্তব্য, তাহাই শিশুর পক্ষে জীবন। মাতার দুগ্ধ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে কম হইলে গরু, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে তাহা পূরণ করিতে হইবে। প্রত্যূষে কিংবা রাত্রিতে এই সকল দুগ্ধ পাওয়া না গেলে, দুই একবারের জন্য শিশুকে বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতার দুগ্ধে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জল আছে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি জিনিষ আছে। যথা—প্রোটিড, স্নেহজাতীয় পদার্থ, শর্করা এবং লবণ। এই দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত হারে মাতার দুগ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

জল	শতকরা	৮৭.২৪	হইতে	৯০.৫৮
কার্ব্বোহাইডেটস (ল্যাক্টোজ)	,,	৩.১৫	,,	৬.০৯
ফ্যাট বা শর্করা (মাখন)	,,	২.৬৭	,,	৪.০৩
প্রোটিড (ছানা)	,,	২.৯১	,,	৩.৯২
লবণ	,,	০.১৪	,,	০.২৮

মাতৃদুগ্ধে প্রোটিড নামক যে পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা দেহের অঙ্গগুলি গঠিত হয়। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে যে ছানার মত পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়—তাহাই প্রোটিড। মানবের আহার্য্যের মধ্যে প্রোটিড না থাকিলে জীবন রক্ষা হয় না। যে সকল উপাদান দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, প্রোটিড—রক্তে সেই সকল উপাদান দান করে। শিশুর খাদ্যে প্রোটিডের অভাব হইলে শীঘ্রই তাহার কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটিডশূন্য খাদ্য খাইলে শিশুর দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, দেহ দুর্ব্বল এবং বিবর্ণ হয়, মাংস থলথলে হয় এবং পীড়া রোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য অংশ গঠন করিবার উপাদান, দুগ্ধের মাখন (ফ্যাট) রক্তের মধ্যে প্রদান করে। দেহের মধ্যে কতক ফ্যাটের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহা দেহের তাপ উৎপাদন করে। ফ্যাট দেহকে গরম রাখে।

আমরা যে শর্করার সহিত সাধারণতঃ পরিচিত, মাতৃ দুগ্ধের শর্করার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও উহা একই জিনিস নহে। দেহের তাপ রক্ষা করা এবং মাখন (ফ্যাট) তৈয়ারী করা এই শর্করার কাজ। ইহার রাসায়নিক নাম কার্ব্বোহাইড্রেটস।

দুগ্ধে যে লবণ আছে, তাহা দেহের হাড় গঠন করে। দেহের অন্যান্য যন্ত্র গঠন করিতে এবং রক্ষা করিতে যে নানাপ্রকার লবণাক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহা এই লবণ—রক্তের মধ্যে দান করে। দুগ্ধের সমস্ত জল, প্রোটিড ফ্যাট (মাখন) এবং শর্করা ফুটাইয়া নিঃশেষ করিলে পর একপ্রকার ছাইয়ের ন্যায় দ্রব্য পতিত থাকিতে দেখা যায়, তাহাই দুগ্ধের লবণ। দুগ্ধ পান করিয়া হজম হইয়া যাইবার পর দুগ্ধের প্রোটিড, ফ্যাট (মাখন) শর্করা এবং লবণ—দুগ্ধের জল দ্বারাই রক্তের মধ্যে নীত হয়। তারপর দেহ গঠনের কার্য্য চলিতে থাকে।

শিশুকে কোন কৃত্রিম দুগ্ধে পালন করিতে হইলে মাতার দুগ্ধে যে পরিমাণে উপরোক্ত পদার্থগুলি আছে, শিশুর খাদ্যেও সেই পরিমাণে উহা থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে একটি পদার্থের অভাবে কিংবা অল্পতায় শিশু রীতিমত খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাহার দেহ পুষ্ট হয় না, অধিকন্তু ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া যায়। মাতার দুগ্ধের পর গাভীর দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছাগল এবং গাধার দুগ্ধের গুণও মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সম গুণ বিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ শিশুকে ৩।৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত খাওয়ান যাইতে পারে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গাধার দুগ্ধে যেরূপ পুষ্টিকর পদার্থ নাই. কারণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গাধার দুগ্ধে মাখনের অংশ অনেক কম। মাতৃ দুগ্ধে শতকরা তিনভাগ মাখন আছে, কিন্তু গাধার দুগ্ধে শতকরা একভাগের কিছু বেশী মাখন আছে। সুতরাং গাধার দুগ্ধ শিশুকে বেশী দিন খাওয়ান চলে না। সাধারণতঃ গাধা দিগকে এত অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয় এবং জঘন্য খাদ্য খাইতে দেওয়া হয় যে. ইহাদের দুধ শিশুকে খাওয়াইলে পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু গাধার দুগ্ধ মহার্ঘ এবং সচরাচর বেশী পাওয়া যায় না। ছাগলের দুগ্ধে আবার মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের অংশ বেশী। এই কারণে প্রথম কয়েকমাস শিশুকে এই দুধ

দেওয়া যাইতে পারে না। শিশুর হজম শক্তির পক্ষে ছাগলের দুগ্ধ ভারী। ৮।৯ মাস হইলে শিশুকে ছাগলের দুগ্ধ দেওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সহরে খাঁটি গাভীর দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। সহরের বাটীতে স্থানাভাব বশতঃ গাভী রাখাও অতিশয় কঠিন। এই কারণে ছাগল পুষিলে শিশুকে তবু খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া যায়। বাটীতে ছাগল পুষিয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া উত্তম খাদ্য আহার করাইলে তাহার যে দুগ্ধ হয়, তাহা শিশুর পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। সকল প্রাণীর দুগ্ধে একই পদার্থ সমূহ বিদ্যমান আছে। তবে তাহাদের পরিমাণে কম-বেশী আছে। মাতৃ দুগ্ধ. গাভী, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে আছে. তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(১০০ শত ভাগে)	জল।	ছানা।	মাখন।	শর্করা	লবণ।
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮·৯০	৩·৪২	৩·৩৩	৪·৫৫	০·২১
গাধা—	৮৯·০১	৩ ৫৭	১·৮৫	৪·৫০	০·৫৫
গাভী—	৮৭·০৫	৪ ২১	৩·৮২	৩·৬৭	০·৭১
ছাগল—	৮৬·৮৫	৩৭৯	৪·৩৪	৩·৭৮	০·৬৫
মহিষ—	৮৪·১০	৪·০০	৭·৬০	৪·০০	০·৮০

মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ ছানা আছে, গাভীর দুগ্ধে তাহার পরিমাণ অধিক এবং শর্করার পরিমাণ কম। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল এবং শর্করা মিশাইয়া শিশুকে পান করাইলে তাহা অনেকটা মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। ২।১ মাসের শিশুর দুগ্ধে যতটা জল মিশান দরকার, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার (Starchy) কঠিন শস্য বা শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলে শিশুকে শস্যজাত শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে আরারুট, রুটি, সাগু, ময়দা, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। তখন এইরূপ খাদ্য খাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। শিশু এরূপ খাদ্য তখন হজম করিতে পারে না। সময় সময় চারি মাসেও দাঁত উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ ছয় মাস হইলেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ছয় মাসের পূর্ব্বে কোন প্রকার শ্বেত-সার বিশিষ্ট খাদ্য কখনো দিবেনা। ছয় মাসের পর উহা অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। কিন্তু দুই বৎসরের পূর্ব্বে খাদ্য ভাল করিয়া হজম করিবার শক্তি জন্মে না। শিশুদের জন্য যে সকল বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ কোন কোন দুগ্ধের ভিতর ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয়

জিনিস আছে। আহারের সময় জিহ্বা হইতে যে লালারস নির্গত হয়, তাহাই শস্ত জাতীয় খাদ্য হজম করে। সাধারণতঃ চারি মাসের পূর্ব্বে শিশুর জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হয় না। এই কারণে চারিমাসের পূর্ব্বে শিশুকে starchy খাদ্য দিলে শিশু তাহা হজম করিতে পারে না।

বেশী পরিমাণে খাইলেই যে শিশুর দেহ পুষ্টিলাভ করে এরূপ বিবেচনা করা নির্ব্বুদ্ধিতা। যতটুকু খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে, তাহাই তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করে। খুব খাইলেই যে শিশুর দেহ সবল ও স্বাস্থ্যবান হইবে এমন কোন কথা নাই। পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়—এরূপ খাদ্য শিশুকে দিতে হইবে। শিশু খুব খাইতেছে—অথচ শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বলই রহিয়াছে—এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যাহা আহার করিতেছে তাহা জীর্ণ করিতে পারিতেছে না। যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পায় না তাহাকে কৃত্রিম খাদ্য দিতে হয়। এইরূপ শিশুর সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারের খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(১) যে খাদ্যে মাতৃদুগ্ধের সম পরিমাণ উপাদান সমূহ আছে।

(২) এই উপাদানগুলি মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণে আছে ঠিক সেই পরিমাণ থাকিবে।

(৩) যে খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে।

(৪) খাদ্য টাট্‌কা হইবে। তাহাতে কোনো ময়লা যেন না থাকে এবং বিস্বাদ যুক্ত না হয়।

(৫) শিশুকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যতটা খাদ্য দিবে তাহার পুষ্টিকারিতা গুণ যেন দশ ছটাক হইতে ত্রিশ ছটাক মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়, তবে তাহাতেই শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন হইবে। একবৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ শিশুই কৃত্রিম খাদ্য আহার করে। অনুপযুক্ত, অপুষ্টিকর খাদ্যই এই মৃত্যুর কারণ।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,)

বুকে সর্দ্দি বসিলে।—(১) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম—মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিতে হইলে একখানি হাতায় কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ রাখিয়া একটি ছোট বাটি দ্বারা উহা চাপা দিয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নি সন্তাপে রাখিলেই উহা ভস্ম হইয়া থাকে। এক বৎসরের শিশুর জন্য এই ময়ূর পুচ্ছ ভস্মের পরিমাণ ১ রতি। এই হিসাবে মাত্রা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অবস্থা-বিবেচনায় ইহা প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ইহার সহিত ১ রতি পিপুলের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করাইলে আরও সুফল দর্শিয়া থাকে। (২) আদার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বুকে ও গলায় মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৩) পিপুল দুই আনা, তুলসীমঞ্জরী দুই আনা, যষ্টি

মধু, মিছরি,বড় এলাইচ ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী চারি আনা, সমস্ত দ্রব্য অগ্নি উত্তাপে দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ঝিনুক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি-কাশীতে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

এঁড়ে লাগায়।—(১) দুগ্ধের সহিত চুণের জল সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক জনিত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ছাতিমফুল, মরিচ ও গোরোচনা প্রত্যেকটী ১ রতি মাত্রায় লইয়া জলসহ শিলায় পিষিয়া কয়েক দিন সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক রোগের উপশম হয়।

জ্বরে।—(১) তুলসীর রস ও মধু শিশুর জ্বর নিবারক। (২) আতইচের গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সাধারণ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। আতইচ বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আতইচের গুঁড়ার মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ রতি প্রাতে ও অর্দ্ধ রতি বৈকালে। জ্বরের সহিত কাশী ও বমির উপদ্রব থাকিলে ও এইরূপ ব্যবস্থায় উপকার হইয়া থাকে। (৩) মুতা, হরীতকী (আঁটীবাদ), নতি, যষ্টীমধু নিমছাল—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে আট কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শিশুর সাধারণ জ্বরে এক ঝিনুক মাত্র খাওয়াইবে, বাকী কাথ ফেলিয়া দিবে। এরূপ ব্যবস্থায় শিশুর সাধারণ জ্বরে সুফল দর্শিয়া থাকে। (৪) নতি, নিমছাল, হরীতকী (আঁটীবাদ), বহেড়া (আঁটীবাদ), হরিদ্রা আমলকী (আঁটিবাদ)—প্রত্যেক দ্রব্য বত্রিশ কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত কাথ ফেলিয়া দিয়া মাত্র একঝিনুক বালককে কয়েকদিন সেবন করাইলে বালকের সাধারণ জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। ৩ এবং ৪নং যোগ দুইটী অন্ততঃ ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু ভিন্ন সেবন করান ঠিক নহে।

বমন রোগে।—(১) কণ্টকারী ও বৃহতী ফলের রস সমান ভাগে সিকি ঝিনুক মাত্র লইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন প্রশমিত হয়। স্তন-দুগ্ধ পান মাত্র যে সব শিশু বমন করিয়া থাকে—তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। (২) আম্রকেশী, সৈন্ধব লবণ ও খই চূর্ণ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগে উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর জন্য ১ রতি। (৩) পিপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া ও কাশীর চিনি প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ রতি করিয়া লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লেবুর রস সহ সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগের উপশম হইয়া থাকে। শিশুর হিক্কা রোগেও এ যোগটীতে উপকার হয়।

মূত্র রোধে।—পিঁপুল, মরিচ, ছোট এলাইচের গুঁড়া, চিনি, সৈন্ধব লবণ—সমান ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহ করাইলে শিশুর মূত্ররোধে উপকার দর্শিয়া থাকে।

মুখ পাকিলে।—অশ্বত্থ গাছের ছাল ও পত্র—উত্তমরূপে বাটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে শিশুর মুখপাকিলে উপকার হইয়া থাকে। এই প্রলেপ দিবার সময় সাবধানে ইহার প্রয়োগ করিবে, যেন চক্ষে না লাগে।

দন্তোদ্ভেদজ রোগে।—শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, অতীসার প্রভৃতি নানা-

প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। বিশেষ কোনো ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা ঠিক নহে, কারণ দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ আপনা আপনিই সারিয়া যায়। এই সময় আমলকীর রস দাঁতের মাড়িতে ঘসিতে থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। ধাইফুল ও পিপুলের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া দাঁতের মাড়িতে ঘসিলেও শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিলেও দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের সাহায্যে ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দূষিত স্তন্যপান জনিত রোগে।—দূষিত স্তন্যপানে শিশুর নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর পেট ফাঁপা উপদ্রব ঘটিলে এক ছটাক দুগ্ধের সহিত ১ তোলা ধনে বা মৌরী ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া পান করানর ব্যবস্থা করিবে। গব্য দুগ্ধের সহিত সমপরিমিত চূণের জলও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। ধাত্রীর স্তন দূষিত হইলে সেই স্তন্যদুগ্ধ শিশুকে কখন পান করিতে দিবে না, ছাগ দুগ্ধ কিম্বা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্য দুগ্ধ পান করান এই অবস্থায় ফলপ্রদ।

ভেদ বমিতে।—(১) কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল এই সকল দ্রব্যের পাতা পিষিয়া লইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়। (২) বেল শুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের ক্বাথের সহিত খইয়ের গুঁড়া ও চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়।

অতিসারে।—আমড়া ছাল, আম ছাল ও জাম ছালের গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) ধাইফুলের গুঁড়া কিম্বা বেলশুঁঠের গুঁড়া—চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। ১ বৎসরের শিশুর জন্য ঐ ২টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির মাত্রা ১ রতি। (৩) ছাগ দুগ্ধ ও জামছালের রস কিম্বা জাম গাছের পাতায় সিদ্ধ করা ছাগ দুগ্ধ শিশুর অতীসার নাশক। (৪) বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), বালা, মোচরস ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া ও জল একসের—একত্র সিদ্ধ করিয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শিশুকে ২।৩ বারে উহা পান করাইলে শিশুর অতীসার প্রশমিত হয়।

আমাশয়ে।—(১) সাদা জীরার গুঁড়া ও সাদা ধুনার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ বৎসরের শিশুর জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধ রতি। (২) খইয়ের গুঁড়া, যষ্টীমধুর গুঁড়া, চিনি ও মধু—সমান ভাগে লইয়া সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় আরোগ্য হয়। মাত্রা পূর্ব্ববৎ।

সফল চিকিৎসা।

(বাতাজীর্ণে লাল চতুর্ম্মুখ।)

অজীর্ণ রোগে সাধারণতঃ কবিরাজী চিকিৎসায় ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খ বটী, হিঙ্গষ্ক চূর্ণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধই ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় সে সকল ঔষধে সুফলও হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় ঐ সকলের ব্যবস্থায় রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে, রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত এইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তর মৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক পশ্চাজ্‌ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর ভিষক জ্ঞানপূর্ব্বক যথা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

অনেক সময় কিন্তু রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এইজন্যই চিকিৎসক সুফল প্রদর্শনে সমর্থ হন না, কিন্তু যদি রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করা যায়—তাহা হইলে তদ্বারা যে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

আমি রাণাঘাটে থাকিতে একটি মৃতকল্প অজীর্ণ রোগীর চিকিৎসায় "লাল চতুর্ম্মুখ" সেবন করাইয়া অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার কথাই আজি বলিব।

রোগীর নিবাস রাণাঘাটেই, রোগী কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী এবং কলিকাতা পোষ্ট অফিসের একজন কর্ম্মচারী। নাম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু। বয়স ৩৫-৩৬ বৎসর। পূর্ব্বে ইনি যথেষ্ট ব্যায়াম করিতেন, তখন তাঁহার শারীরিক গঠন খুব দৃঢ় ছিল। ডাকঘরের চাকরি লইয়া পদোন্নতি কামনায় ইনি প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন। অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন—অথচ উপযুক্ত আহার ছিল না, ফলে তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করার পরেই দারুণ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। অজীর্ণ বায়ু জনিত। সর্ব্বদাই পেট ফাঁপিত, কোষ্ঠ শুদ্ধি হইত না, আহার করিতে পারিতেন না, শিরঃপীড়া বোধ হইত, বুক ধড়ফড় করিত, রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইত না, স্বপ্ন ভঙ্গ হইত, কোনো কার্য্যে উৎসাহ ছিল না, ক্রমে কার্য্য করিবার সামর্থ্য একেবারে নষ্ট হইল, যাহা খাইতেন, তাহাই অজীর্ণ হইতে লাগিল, ক্রমে অর্শ আসিয়াও উপস্থিত হইল।

রোগীর কর্ম্মস্থান কলিকাতায়, বিশেষতঃ তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি এ, উপাধিধারী—শিক্ষিত ব্যক্তি, কাজেই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দিগের হাতেই পড়িল। কয়েকজন আলোপাথ দেখিলেন, কয়েকজন হোমিওপ্যাথ দেখিলেন, শেষে কলিকাতার কয়েকজন প্রথিতনামা কবিরাজও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। অনেকে Change যাওয়া বা হাওয়া পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তিনি

সেই পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া "কৈলোয়ারে" পর্য্যন্ত কয়েকমাস কাটাইয়া আসিলেন।

কৈলোয়ারে গিয়া তাঁহার রোগের শান্তি ত হইলই না, বরং রোগ আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তিনি অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বস্ব হইলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তখন একরূপ তাঁহার হাড় কয়খানি মাত্রই অবশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়গণ আর তাঁহাকে কৈলোয়ারে রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার আবাস ভূমি রাণাঘাটে লইয়া আসিলেন। কিন্তু "যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতিঃ।"

এজন্য রাণাঘাটে মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া আসা হইলেও রাণাঘাটের কয়েকজন প্রসিদ্ধ অ্যালোপাথ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে বলিলেন,—এ রোগীর জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা করান বৃথা।

এই সময় রোগীর মাতুল গবর্ণমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয় রোগীকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। দুইজন দুই দিকে ধরিয়াছে, রোগী অতি কষ্টে হাঁটিয়া আসিতেছে—এইরূপ ভাবে রোগী আমার চিকিৎসালয়ে আগমন করিলেন। আমার সহিত তখন তাঁহার পরিচয় ছিল না, আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—"ইঁহাকে কষ্ট দিয়া কেন লইয়া আসিলেন? আমাকে লইয়া গেলেই তো ভাল হইত।" রোগীর মাতুল বলিলেন,—"ইঁহার আর কোনো চিকিৎসায় বিশ্বাস নাই, সেইজন্য আর অধিক অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক নহেন। আমি একরূপ আপনাকে শেষ দেখান দেখাইব বলিয়া জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছি।

আমি স্থির ভাবে তাঁহার সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিলাম। নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—নাড়ী বাতপ্রবণ এবং অতিশয় দুর্ব্বল। রোগীই আমাকে তাঁহার রোগের আদ্যোপান্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। রোগ-পরিচয়ে তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে, আমি তাহার পূর্ব্বে কোনো রোগীর নিকট সেরূপ পরিষ্কার ভাবে রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে দেখি নাই। রোগী যারপরনাই দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তখন তাঁহার কথা কহিতেও যেন কষ্ট হইতেছিল। তিনি খুব কষ্ট করিয়াই তাঁহার রোগের সকল কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আমার আর চিকিৎসা করানর ধৈর্য্য নাই, আপনি ত রাণাঘাটে পড়িয়া আছেন, কলিকাতার বড় বড় অ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজের আমি শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কেহই কিছু করিতে পারেন নাই, রাণাঘাটেরও যে কয়জন বড় ডাক্তার আছেন—সকলকেই দেখাইয়াছি। —এক কথায় আমার মত গৃহস্থের পক্ষে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করান যাইতে পারে, তাহা আমি করিয়াছি। এখন সকলেই জবাব দিয়াছেন। আমি এখন মরিবার জন্যই প্রস্তত হইয়াছি। মামার নিতান্ত অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমি বেশী দিন আপনার চিকিৎসায় অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোনোরূপ উপকার প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে এক সপ্তাহেই আপনার দ্বারা চিকিৎসা করানর

সাধ আমার মিটিয়া যাইবে। আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি এরূপ কোনো ঔষধ থাকে—যাহাতে মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিতে পারে,—তবে তাহাই আমাকে প্রদান করুন। নতুবা কোনো ঔষধ দিবেন না।”

কোনো রোগী আমার নিকট এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই, কোনো চিকিৎসকের নিকট আর কোনো রোগীও এরূপ কথা বলিয়াছে কি না তাহাও আমি জানিনা। ফলে রোগীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে সাধারণতঃ সে রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও সেরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ সে সম্বন্ধে তো বলিয়াছেন,—

বৈরী বৈত্তবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনঞ্চ শঙ্কিতঃ।
ভিষজার্ম বধেয়াশ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ বিধাঃ॥

অর্থাৎ শত্রুতা ভাব সম্পন্ন বৈদ্যধূর্ত্ত, বিশ্বাসহীন, শঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য ও চিকিৎসক কল্প—এই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা করিবেনা।

কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম,—রোগে ইঁহাকে এইরূপ চিকিৎসায় বিশ্বাসহীন করিয়াছে, নতুবা ইনি যেরূপভাবে আত্মরোগ বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ইনিই ত সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসার উপযুক্ত পাত্র। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“নিজ প্রকৃতি বর্ণভ্যাং যুক্তঃ সত্তেন চক্ষুষা
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈত্ত ভক্তো জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে আমাদের লিখিত রোগীর সমস্ত গুণ না থাকিলেও নিজ রোগ বিবরণ ইনি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইনিই তো চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসার যোগ্য।

যাহা হউক আমি তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলাম। ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম—অজীর্ণের বাঁধাধরা নিয়মে নহে,—একটু রকমারি করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা করিলাম। তাঁহাকে প্রথম সপ্তাহে যে কয়টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাতে—লাল চতুর্ম্মুখ।

রস সিন্দুর, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ ভস্ম এক চতুর্থাংশ। ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া, এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি বটী—যাহা বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত আছে—সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। অনুপান দিলাম—বায়ু রোগ শান্তির বাঁধা নিয়মে ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু।

দিবসে আহারান্তে

ভাস্কর লবণ—

ইহার মাত্রা দিলাম এক আনা মাত্র। অনুপানের ব্যবস্থা করিলাম—টাট্‌কা ঘোল।

সন্ধ্যায়—বজ্রক্ষার।

মাত্রা এক আনা। অনুপান—মৌরী ভিজান জল।

আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে জীর্ণ হইত না বলিয়া রোগী একেবারে ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—“তাহা হইবে না, একবেলা ভাত ও একবেলা সাগু খাইবেন। ভাত কিন্তু যাহা খাইবেন, তাহাতে উদরপূর্ত্তি সম্যকরূপে করিতে পারিবেননা, অর্দ্ধেক হিসাবে খাইবেন। প্রাতে এবং বৈকালে পাকা পেঁপে কিছু খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। দিবসে যে ভাত খাইবেন, তাহা যেন বেলা ১১টার পর না হয় এবং ১১টার পূর্ব্বেও না হয়, অর্থাৎ

ঠিক একই সময়ে আহারকাল ঠিক রাখিবেন। খুব প্রত্যূষে সামর্থ্য মত একটু একটু হাঁটিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। বৈকালেও ঐরূপ যতটুকু সহ্য করিতে পারেন, করিবেন। দিবসে একেবারেই শয়ন করা চলিবে না, রাত্রিতে ৯টার পর কিন্তু নিদ্রা না আসিলেও শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাতের সঙ্গে বেশী ব্যঞ্জন খাইতে পাইবেননা, জীবিত মৎস্যের ঝোল এবং ভাত। মৎস্যের ঝোল যাহা রন্ধন করা হইবে—তাহাতে লঙ্কা মরিচের ঝাল একেবারে দেওয়া হইবে না।"

রোগীকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবে তিনি এক সপ্তাহ আমার ব্যবস্থায় থাকিলেন, এরূপ চমৎকার ফল হইল যে, তাহাতে আমি তো আশ্চর্য্য হইলামই, রাণাঘাটের যে বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাণাঘাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় আমার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ওজন লইয়াছিলেন, এই সময় আবার ওজন লইয়া দেখিলেন—ওজনে তিনি একসের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রোগীরও স্ফূর্ত্তি হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগী অতি আহ্লাদের সহিত আমার নিকট আগমন করিয়া সকল কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও আমি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের ব্যবস্থাই বজায় রাখিলাম। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ। ব্যবস্থার আর পরিবর্ত্তন করিলাম না, একই ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলাম। কয়েক সপ্তাহের পর রোগীর উদরাময় দেখা দিল, আমি এই সময় বৈকালের ঔষধটি বদলাইয়া দিয়া তাহার স্থলে "চিত্রকাদি গুড়ি"র এক একটি গুড়িকা শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলাম। এই চিত্রকাদি গুড়ির ব্যবস্থার সময় রোগী বলিলেন, "মহাশয় ঐ ঔষধটি দিবেন না, উহা আমি কলিকাতায় * * কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। ঐ ঔষধে আমার ভক্তি নাই।" আমি বলিলাম—"তখন উপযুক্ত কাল হয় নাই বলিয়া আপনি তখন ফল পান নাই, এখন ইহা ব্যবহার করিলে ফল পাইবেন।"

ফলে এইরূপ ভাবে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দিন দিনই তাঁহার বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। রাণাঘাটের অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

আহারের ব্যবস্থাও আমি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ এক বেলা ভাত ও এক বেলা গরম গরম খোলা হইতে গব্য ঘৃতে ভাজা টাটকা লুচি খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম, রোগীর এই সময় ক্ষুধা খুব, যাহা খান তাহাই অতি শীঘ্র জীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তিনি একদিন বলিলেন, 'কবিরাজ মহাশয়, বহুকাল সন্দেশ খাই নাই, উহা খাইতে ইচ্ছা করিতেছে, একটি খাইব কি?' আমি খাইবার ব্যবস্থা দিলাম, কিন্তু রোগীর এতই সংযম শিক্ষা যে, আমি ব্যবস্থা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তবে তিনি উহার একটি মাত্র খাইয়াছিলেন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

শারীরিক বল বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে প্রাতর্সায়াহ্নে ভ্রমণের ব্যবস্থা খুব বেশী করিয়া দিলাম। ক্রমশঃ তিনি প্রাতে এক ক্রোশ ও বৈকালে এক ক্রোশ রাস্তা রাণাঘাট ষ্টেসনের দক্ষিণাংশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে ৬ মাস কাল তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। শেষে তাঁহাকে স্নায়ু সকল সতেজ করিবার জন্য একবার করিয়া 'স্বর্ণবঙ্গ' সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। নিত্য দাস্ত পরিষ্কার রাখিবার জন্য কখন কখন 'প্রাণদা গুড়িকা' সেবন করিতে দিতাম। এই প্রাণদা গুড়িকা শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী দিয়া প্রস্তুত। বায়ু শান্তির জন্য কখন কখন বিষ্ণু তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতাম। যাহা হউক ৬ মাস পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন কিন্তু তখনি কার্য্যে join না করিয়া আরও কিছু দিন পরে কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

রোগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেও তিনি কিন্তু চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি ১ বার করিয়া লাল চতুর্ম্মুখ সেবন করিতেন। আমিও বুঝিয়াছিলাম অন্যান্য যে সকল ঔষধেরই ব্যবস্থা করিনা কেন,—একমাত্র 'লাল চতুর্ম্মুখেই এরূপ শুভফল প্রদান করিয়াছে, রোগীও বুঝিয়া ছিলেন,—ঐ ঔষধই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন রোগী এরূপ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন যে, কখন যে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল—এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন তিনি কলিকাতা পোষ্ট অফিস সমূহের জেনারাল করস্‌পণ্ডেণ্ট বিভাগের হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতায় সকল পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারিগণই তাঁহার সে সময়ের অবস্থা অবগত আছেন।

কবিরাজী ঔষধের শাস্ত্রীয় শ্লোক দেখিয়া অনেকে কবিরাজী ঔষধে 'গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়' বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। ফল-মূলাশী আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান গভীর গবেষণা দ্বারা যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ফলশ্রুতি উপলক্ষে সেই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ নিবারক বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য কথা। রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে কবিরাজীর প্রত্যেক ঔষধটিই নানাবিধ রোগ আরোগ্যে সমর্থ। আমি যে লিখিত রোগীটির জন্য চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,—তাহার কারণ, ঐ রোগীটির রোগ তখন যে আকারই ধারণ করুক, উহার মূল কারণ বায়ুর বৈষম্য। চতুর্ম্মুখে যে সকল উপাদান আছে, তাহার মধ্যে লৌহ—তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন।

অভ্র—কষায়,মধুর, শীত বীর্য্য, আয়ুস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমিনাশক ও বিষঘ্ন।

স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদায়ক বিষঘ্ন ও পবিত্র।

রস সিন্দুর—ক্রিমিনাশক,কুষ্ঠঘ্ন, স্বাস্থ্য প্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকাল মৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান, জ্বরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডুরোগ প্রশমক এবং উপযুক্ত ক্কাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধি নাশক।

ঐ দ্রব্য গুলির মিশ্রণে তাহার পর ঘৃতকুমারীর রস সহ মর্দ্দনে ও তদনন্তর ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন স্থাপনে উহার যে শক্তি

সঞ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

এতদ্রসায়ন বরং ত্রিফলামধুযোজিতম।
তদ যথাগ্নি বলং খাদেদ বলীপলিত নাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্য বাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ব্বগামযান্॥
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনি যথা।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসব কারণম্॥

অর্থাৎ ত্রিফলা ও মধু রসহিত এই ঔষধ সেবনে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট হয়, একাদশ প্রকার ক্ষয়জ ব্যাধি প্রশমিত হয়, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহরোগ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার বাত, বিসর্প, বিদ্রধি অপস্মার, উন্মাদ ও অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমি অনেক রোগেই যেখানে রোগের মূল কারণ বায়ুর বিকৃতি বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই স্থানেই চতুর্ম্মুখের ব্যবহারে এরূপ অদ্ভূত ফল পাইয়া থাকি যে, অনেক সময় অনেক ঔষধে সেরূপ সুফল দেখিতে পাইনা।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন)

১। কালান্তক রস।*

স্বর্ণ ১	হরিতাল ১	হিঙ্গুল ১	লৌহ ১
বঙ্গ ১	সোহাগা ১	জীরা ১	বিষ ১
দারমুষ ১	অহিফেন ১		

এই দশখানি দ্রব্য প্রত্যেক সমান ভাগ ওজন করিয়া লইবে। ইহার মধ্যে স্বর্ণ ও লৌহ এবং বঙ্গ এই তিনখানি দ্রব্য শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিধি পূর্ব্বক ভস্ম করিয়া এই ঔষধে প্রযুজ্য। হরিতাল শব্দে বংশপত্রী হরিতালই গ্রহণীয়। হরিতাল ভস্ম করিয়া লইলেও হয়, অথবা জলে শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারে। অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল প্রকার শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার বিবরণ আমরা ইহার পর বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

প্রথমতঃ শোধিত হিঙ্গুল, হরিতাল, দার-

---

* সুবর্ণং তালকং রক্তং তীক্ষ্ণ বঙ্গং সটঙ্গনং।
এতৎ সর্ব্বং সমং গ্রাহ্য সুক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ।
কেশরাজ রসেনাপি অজা ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্ব ব্যাধি হরশ্চৈষঃ ব্যাধি-বারণ-কেশরী।
জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি নানা দোষোত্থবং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ ছয়ং গুল্মং বিনাশয়েৎ।
রসো কালান্তকোনাম শূলিনা পরিনির্ম্মিতং।
জীরকঞ্চামৃতং দারু ফণি ফেণং তথৈব চ॥
হিঙ্গুলী স্বরসৈর্ভাব্যং ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ পুনঃ॥
গুঞ্জার্দ্ধং বটিকাং কুর্য্যাৎ দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
সংগ্রহ গ্রহণীং হন্তি চিরকালানু বন্ধিনীম্॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু শোথং শূলং প্রবাহিকাং।
অগ্নিঞ্চ কুরুতেদীপ্তং বলবর্ণৌ প্রসাদয়েৎ।
ঔষধস্ত প্রসাদেন অকালে মরণং ভবেৎ।
(আদিত্য সংহিতা)

মৃগ, জীরা এবং বিষ—প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এমন ভাবে চূর্ণ করা চাই, যাহাতে কিছুমাত্র কুচি না থাকে। সোহাগা খোলায় ভাজিয়া খই করিয়া লইবে। গাঢ় পরিস্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। ঔষধের প্রত্যেকটী উপকরণ সংগ্রহ হইলে, তারপর একটা পরিমাণ স্থির করিবে। সিকি তোলা, অর্দ্ধ তোলা, এক তোলা অথবা যাঁহার যেরূপ সুবিধা ও প্রয়োজন সেইরূপ মাত্রায় প্রত্যেকটী দ্রব্য ওজন করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। তবে কথা এই—সকলগুলি দ্রব্যই ভাগে সমান হওয়া চাই। এইরূপে সমস্তগুলি উপকরণ মর্দ্দিত ও মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকী অর্থাৎ কালো রঙ্গের বেগুণের রস বাহির করিয়া তদ্দারা ঐ মিশ্রিত ঔষধ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে ; এবং প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে দিবাভাগে তরল পদার্থ মর্দ্দন ও শুষ্কীকরণ এবং রাত্রিকালে শিশির সেচন করানকে ঔষধের ভাবনা দেওয়া কহে। প্রতিদিন এক একটী করিয়া ভাবনা দেওয়া বিধান। কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকীর স্বরসে সাতদিন সাতবার ভাবনা দেওয়া হইলে তাহার পর আবার * ভৃঙ্গরাজ পত্রের স্বরসে ঐরূপ সাতদিনে সাতবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে কেশরাজ অর্থাৎ কেশুরের স্বরসে ঐ প্রকার সাতটী ভাবনা দিতে হইবে। এই তিন দ্রব্যের স্বরসে ভাবনা সম্পন্ন হইলে শেষ দিন উপযুক্ত পরিমাণ ছাগ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় এক একটী বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর বটিগুলি প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া কাচকুপী মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে কালান্তক রস কহে। এই কালান্তক রস বিবিধ রোগে প্রযুজ্য। তৎ সমুদয় উল্লেখ করিবার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ওলাউঠা রোগের যে অবস্থায় যে নিয়মে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়—এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিসর্পণ চূর্ণদ্বারা নাড়ীস্পন্দন অবিকৃত থাকে এবং শরীরস্থ সপ্ত ধাতুক্ষয় নিবারিত হয়। এই কালান্তক রসের অচিন্তনীয় প্রভাবে যাবতীয় বৈকারিক লক্ষণ, অতিরিক্ত মল নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে থাকে। পূর্ব্বে অহিফেনের প্রয়োগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে হইবে। মধ্য বা পরিণত অবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এই ঔষধে অহিফেণের প্রয়োগ-বিধান লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য উপকরণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অহিফেন এমনভাবে গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তদ্দারা মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ারোধ হইতে পারে না। অহিফেনের নৈসর্গিক শক্তির বলে যদিও মূত্রযন্ত্রের আংশিক ক্রিয়ারোধ হয় সত্য, তথাপি তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া সহসা প্রাণনাশের কারণ হয় না। ঔষধের প্রয়োগে অল্পায়াসেই যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে। অবিরত অতিরিক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে অচিরেই ধাতু ক্ষয় ঘটে। সুতরাং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইতে বড় বিলম্ব থাকে না। এই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ রূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধের প্রয়োগে মল নিঃসরণ রোধ হইয়া আইসে এবং শারীরিক যন্ত্রগুলি অবিকৃত ভাবে অবস্থিতি

* ভীমরাজ।

করে। অধিকন্তু মূত্রের রোধ জন্য এরূপ অবস্থায় কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। এই কালান্তক রসের অনির্ব্বচনীয় ফলোপধায়িণী শক্তি সর্ব্বতোভাবে বহু ক্ষেত্রে বহু বার পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিশেষের দ্বারা রোগীর প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ নারী-স্পন্দনের একেবারে বিলুপ্তি ঘটে—নানাবিধ বৈকারিক লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ক্রমে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করে—দেখিতে দেখিতে রোগী চৈতন্য হারা হয়—তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিসর্পণ চূর্ণ অনুপান সহ রোগীকে সেবন করাইয়া শেষে যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কাহাকেও কালকবলে পতিত হইতে হয় না। প্রতি দাস্তের পর এই ঔষধের প্রয়োগ চলিতে পারে। দুই তিনবার ঔষধ সেবন করিলেই যদি মল পীতবর্ণ হইতেছে দেখা যায়,তাহা হইলে আর অধিক সেবন করান উচিত নহে। সাধারণতঃ প্রয়োজনানুসারে দাস্ত বন্ধের জন্য দিনের মধ্যে একবার অথবা দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার এই ঔষধ সেবন করান উচিত। মলের পীতবর্ণতা লক্ষিত হইলেই বুঝিতে হইবে—রোগীর জীবন রক্ষা পাইল। তখন আর মূত্র নিঃসরণের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। অল্পায়াসেই অথবা অপনা হইতেই মূত্র নির্গত হইতে থাকে। মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত না থাকিলে চারি প্রহর বা আট প্রহর পরেও কাহারও কাহারও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। মূত্র নিঃসরণের কথা পরে যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব। এক্ষণে কালান্তক রসের সহপান ও অনুপানের বিষয়ই উল্লিখিতব্য। যাহার সহিত ঔষধ মাড়িয়া পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে সহপান এবং ঔষধ সেবনের পর যাহা পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে অনুপান বলে।

রোগীর উদরে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে আপাঙ্গমূলের রস অর্দ্ধ তোলা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এক তোলা সহ একটী মাত্র কালান্তক রস উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপ যতবার প্রয়োজন হয়—ততবার সেবন করাইবে।

কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উক্ত মূল কুটিয়া লইবে। এবং পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহন করিবে। এই রসের সহিতই ঔষধ সেব্য। উদরে বেদনা না থাকিলে কালো জামের কচি কচি পাতা অথবা কচি কচি বট পাতা পাথরে কুটিয়া রস বাহির করিবে। সেই রসের অর্দ্ধ বা এক তোলার সহিত এই কালান্তক রস সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে। নাভিমূলে বেদনা থাকিলে অথবা আমের সঞ্চার বুঝিলে পাথর কুচি পাতার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে মূত্র নিঃসরণেরও সহায়তা হইয়া থাকে।

বিকার নাশের জন্য ঝাঁপিটেপারির রসের সহিত এই ঔষধ প্রযুজ্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। উল্লিখিত রসগুলি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইলেই ভাল হয়। অথবা দগ্ধ লৌহ ঐ রস মধ্যে নিষিক্ত করিলেও চলিতে পারে।

এতাবৎ যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োগ-বিধান কথিত হইল,—তৎসমুদয় উল্লিখিত সহপান

ও অনুপানের সহিত নিয়মিত রূপে সেবন করাইলে যখন রোগীর চক্ষু চঞ্চল ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষুর তারা উৰ্দ্ধপক্ষী হইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক—নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে এবং মুহুর্মুহু মাথায় শীতল জল সেচনের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ অবস্থায় মস্তকে শীতল জল সেচন না করিলেই বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা না থাকিলে নাড়ী অবিলম্বে চঞ্চলা হইয়া উঠে এবং চক্ষু দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া পড়ে,—এমন কি, অবশেষে ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের ঠিক এইরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত কোনও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চিকিৎসা-প্রকরণের অধিকাংশ ঔষধই "আদিত্য সংহিতা" নামক বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানলব্ধ ক্রিয়া-পদ্ধতিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে। অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতিপয় দৃষ্ট ফল মহৌষধ উল্লিখিত হইতেছে। এই সকল ঔষধ রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযুজ্য। এতদ্বারা সকলেরই যে নিশ্চয়রূপে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্ত নহে। যখন রোগীর দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং বাক্‌শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না,—নাড়ী একেবারে বসিয়া যায়, তখন আর কোনরূপ বিচার না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র "বিসূচী বিধ্বংসী রস" অথবা "বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস" প্রয়োগ করিবে। এক বৎসরের শিশুদিগকে অর্দ্ধ বটী, তদূর্দ্ধ বয়সের বালক দিগকে এক বটী এবং বলবান যুবক দিগকে একত্র দুই বটী করিয়া সেবন করাইবার বিধি। ঝাঁপিটেপারীর মূলের রস সহ বটী সেবন করিতে দিয়া পরে কিঞ্চিৎ ডাবের জল সেবন করান কর্ত্তব্য। অথবা কেবল ডাবের জল সহও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত দুইটী ঔষধই এক-বিধ সহপান ও অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই দুইটী ঔষধই তিন বারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে হয় না। ঔষধ সেবনান্তে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং নাড়ী স্পন্দনবতী হইয়া উঠিলে নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল-জল-সেচন ও তক্রাদি সেবন করাইবে। ক্রমে ক্রমে বৈকারিক লক্ষণ বিদূরিত হইলে যথেষ্ট শীতল জলে স্নান এবং শরীরের অবস্থা অনুসারে ক্ষুধানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে। কিন্তু ডাবের জল, ইক্ষু রস, দাড়িম্ব রস, দধি, কাঞ্জি, এই সকল দ্রব্য দিতেই হইবে। ঔষধ সেবনের পর যদি নাড়ীতে স্পন্দন এবং চক্ষুতে রক্তবর্ণতা না আইসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই ঔষধে কোন উপকার হইল না। তাদৃশী অবস্থায় শীতল ক্রিয়াদিও করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে "বিসূচী বিধ্বংস রস" ও "বৃহৎ সূচিকাভরণ রস" কি কি উপকরণে, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়—তাহাই লিখিত হইতে হইতেছে।

বিসূচী বিধ্বংস রস।*

* টঙ্কনং মাক্ষিকং শুণ্ঠী পারদং গন্ধকং বিষং।
মর্দ্দয়েৎ জম্বীর দ্রাবৈ র্বটী কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
বিসূচীং নাশয়ত্যাশু দধ্যান্নং পথ্যমাচরেৎ।
গরলং সমভাগেন সর্ব্বেষাং হিঙ্গুলং সমং॥
শ্বেত সর্ষপ তুল্যাচ মৃত সঞ্জীবনী তথা॥
ত্রিদোষস্মমতীসারং সর্ব্বোপদ্রব সংযুতম্॥
ইতি রসেন্দ্র কৌমুদী

সোহাগার খই ১ ভাগ।
স্বর্ণ মাক্ষিক (শোধিত ও জারিত) ১ ভাগ।
শুঁঠ ... ১ ভাগ
{ পারদ
{ গন্ধক (শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ২ „
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ „
কৃষ্ণসর্প বিষ (শোধিত) ... ১ „
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ „

এই আটখানি দ্রব্য উপরের লিখিত মত ওজন করিয়া লইবে। পরে কিঞ্চিৎ গোঁড়া লেবুর রসে কাষ্ঠবিষ ভিজাইয়া রাখিবে। বিষগুলি যখন কোমল হইয়া আসিবে—তখন তাহা শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং ইহাতে সর্পবিষও মিশাইয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত শোধিত হিঙ্গুলখানি ওজন করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ যাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেই চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল এই বিষ মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিবে—যেন তাহা সর্ব্বতো-ভাবে মিশিয়া যায়। তদন্তর কজ্জলী, শুঁঠ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং সোহাগার খই ইহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে এবং রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে সাতদিনে সাতবার জামীরের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমিত এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। খুব সতর্কতার সহিত এই ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। নখ-মধ্যগত অথবা লোমকূপ প্রবিষ্ট হইয়া এই ঔষধ শরীরে বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে।

সূচিকা ভরণ রস।*

কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ ভাগ
সর্প বিষ (শোধিত) ... ১ „
দারুমুজ (শোধিত) ... ১ „
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ „

এই চারিখানি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপরি লিখিত ভাগে ওজন করিয়া এমনভাবে একত্র মর্দ্দন করিবে যে, প্রত্যেকটী দ্রব্যই যেন সুন্দররূপে মিশিয়া যায়। তারপর পঞ্চ পিত্তের প্রত্যেকটী দ্বারা এক এক দিন এক এক বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে।--রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে। পূর্ব্বেই এই সকল পিত্ত সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টাধ্যায়ে লিখিত বিধি অনুসারে শোধন ও শুদ্ধিকরণ করিয়া রাখিবে, পরে প্রয়োজন মত ইহার কিয়দংশ জলে গুলিয়া তদ্বারা ভাবনা প্রদান করিবে। ইহার অনুপান "বিসূচী বিধ্বংস রসে"র ন্যায়ই জানিবে। ইহাও দুই তিন বারের অধিক কাহাকেও সেবন করিতে দেওয়া হয় না। ঔষধ সেবন করাইয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইলে, রোগীর গাত্রে তিল তৈলাদি মর্দ্দন ও অপরাপর শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। ঔষধের অমোঘ প্রভাবে মৃত প্রায় ব্যক্তিও উজ্জীবিত হইয়া উঠে। যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, ক্ষুর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষত করিলে যদি রক্তের কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে সর্ষপ প্রমাণ (অর্থাৎ সূচিকার অগ্রভাগে যে

* অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং।
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাত কুলান্তকৃৎ।
সহস্রশো দৃষ্ট ফলেয়ং বটিকা॥
পঞ্চ পিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপোমাং বটীং চরেৎ॥
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধি ভক্তকং॥

(রসেন্দ্র কৌমুদী)

পরিমাণ ঔষধ সংলগ্ন থাকে) 'সূচিকা ভরণ' অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র রস মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা শরীরে উষ্ণতা এবং নাড়ীতে স্পন্দন উপলব্ধি হইলে শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নতুবা জীবনের আশা বৃথা। নিম্নে বৃহৎ সূচিকা ভরণের বিষয় লেখা যাইতেছে। যাহার শক্তি এতদপেক্ষা বহু গুণেই গরীয়সী।

বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস।*

পারদ, গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	...	২ ভাগ
সিষা (শোধিত ও জারিত)	...	১ ,,
অভ্র (শোধিত ও জারিত)	...	১ ,,
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত)	...	১ ,,
কৃষ্ণ সর্প বিষ (শোধিত)	...	১ ,,

পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি দ্রব্য যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে চরিদিনে চার বার ভাবনা দিবে। বরাহ পিত্তে ইহার ভাবনা দিবার নিয়ম নাই। চারিপ্রকার পিত্তের ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তত করিবে। কেবল নারিকেল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত; বিসূচিকা, ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপসংহিত হয়। যখন রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আইসে এবং বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করাইবার পর, রোগীর গাত্রে তিল তৈল ও চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি শীতল ক্রিয়া এবং নারিকেলজল পান ও দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মরন্ধ্র রস। †

পারদ, গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	..	২ ভাগ
অভ্র (জারিত)	...	১ ,,
হরিতাল (শোধিত)	...	১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত)	...	১ ,,
মরিচ	...	১ ,,
সোহাগার খই	...	১ ,,
সৈন্ধব লবণ	...	১ ,,
বিষ (শোধিত)	...	৮ ,,

এই নয়খানি দ্রব্য উপরে লিখিত ভাগে একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যখন ঔষধগুলি সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যাইবে তখন শোধিত মহিষী পিত্তের জলে আবার অবিরত মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ঔষধের দ্রব্য সমষ্টি পরিমাণ যত হইবে, তাহার চতুর্থাংশ মহিষী পিত্ত কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া লওয়াই শাস্ত্রের বিধান। ঔষধগুলি ভিজিতে পারে, জলের পরিমাণ এইরূপ হইলেই চলিবে। কথিত

---

* রস গন্ধক নাগাভ্রং বিষং স্থাবর জঙ্গমম্।
সূচিকা ভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিসূচ্যামতীসারকে।
পয়ঃ পেটী শতং দদ্যাৎ ভোজনং দধি ভক্তকম্।
রোগিণো যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ॥
মাৎস্য-মাহিষ-মায়ুর-চ্ছাগ পিত্তৈ বিভাবয়েৎ॥
দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃ পেটী জলেন চ॥
ত্রিদোষজে তথা কাসে দানয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
তথা সুভজ্জিতং মাসং লেপনং তিল চন্দনৈঃ॥

রসেন্দ্র কৌমুদী।

† রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
সর্ব্ব পাদ সমোপেত মহিষী পিত্ত মর্দ্দিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যং সন্ন্যাস জ্ঞান সঙ্গমো॥
সহস্র কলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
টঙ্গনং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশ মমৃতং তথা॥
ইক্ষু মুদ্গং রসং ভোজ্যং তক্র ভক্তং যথেপ্সিতাং॥

(রসেন্দ্র কৌমুদী)

পিত্ত দ্বারা ঔষধগুলি সুন্দররূপে মর্দ্দিত হইলে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণাবস্থাতেই রাখা যাইতে পারে। অথবা বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে চলে। আমাদিগের বিবেচনায় বটী প্রস্তুত করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে ঔষধস্থিত পিত্তগুলির বীর্য্য অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঔষধ সেবন করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষত করিয়া সেই ক্ষত স্থানে এই ঔষধ লাগাইয়া দিতে হয়। ঔষধ লাগাইবার পর মৃদু হস্তে মর্দ্দন করা উচিত। যদি রক্তের সহিত ঔষধ সংলগ্ন হইতে পারে তবেই উপকার হইবার সম্ভাবনা। এত দ্বারা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া সূচিত হইলে এবং শরীর গরম হইয়া উঠিলে রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে ও মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে। শরীরে চন্দনাদি লেপন, ইক্ষু রস, মুগের যূষ ও তক্রাদির যথেষ্ট পানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ প্রয়োগে শরীর গরম না হইলে জীবনের আশা করা যায় না।

ওলাউঠা রোগের মূত্র নিঃসরণ ও পীতবর্ণ-মল নির্গমণ হইতে থাকিলে কখনও কখনও কোনও কোনও রোগীর ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পানের রস অথবা দোষানুযায়ী অন্য কোনও অনুপানের সহিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও কর্পূর—প্রত্যেকটি দুই এক রতি মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে প্রভূত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে বৈকারিক লক্ষণ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

উপযুক্ত অনুপানের সহিত "বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব" সেবন করিতে দিলেও এরূপ অবস্থায় সবিশেষ সুফল দেখা যায়। এস্থলে মকরধ্বজ ও বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব প্রস্তুতের নিয়মাবলী উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। এই দুই ঔষধের প্রস্তুতের বিশদ প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রচলিত সকল গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। এক্ষণে উপসর্গ-চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা নিতান্তই প্রয়োজন।

ওলাউঠা রোগের পরিণামে সকল রোগীরই চক্ষুঃ কোটরগত হইয়া থাকে। তেলাপোকার বিষ্ঠা জলের সহিত মাড়িয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে এই উপসর্গের সবিশেষ উপকার হয়।

নিরামিষ খাদ্য।

—:*:—

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল)

নিরামিষ আহার অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বো-হাইড্রেট্স (carbo-hydrate) প্রধান, কিন্তু প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যে প্রোটিড এবং চর্ব্বিই প্রধান। কার্ব্বোহাইড্রেট উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও শ্বেতসারের আকারে অবস্থান করে। নিরামিষ খাদ্য যে একেবারে প্রোটিড হীন তাহা নহে,—দাল প্রভৃতিতে উক্ত পদার্থ

অধিক মাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু বাদাম, নারিকেল প্রভৃতিতে চর্ব্বিই অধিক পরিমাণে থাকে।

উদ্ভিজ্জ আহারের ভিতর পুষ্টিকর পদার্থ যথা, প্রোটিড, চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাই ড্রেট।

অল্প সোডিয়ম ক্লোরাইড (sodium cloride) মিশ্রিত জলে উদ্ভিদ প্রোটিড (vegetable-protied) সহজেই দ্রব হইয়া যায়। উদ্ভিদ প্রোটিড বা প্রাণী প্রোটিড সিদ্ধ করিলে দুষ্পরিপাচ্য হয়। ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয় যে, মাংস বেশী সিদ্ধ করিলে দুষ্পাচ্য হয়, কারণ তাহাতে প্রোটিড অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান; আর উদ্ভিদ সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য হয় কারণ তাহাতে কার্ব্বো হাইড্রেট অংশ অধিক।

আমরা দেখিতে পাই যে, শস্যের বীজ সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে প্রচলিত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রবিশস্যের বীজে অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা ফস্ফেট অব ক্যালসিয়ম্ (phosphates of calcium) ম্যাগনেসিয়ম (magnesium) পটাস (potash) লৌহ (iron) এবং সিলিকা (silica) প্রধান প্রধান রবিশস্যের ভিতর কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থের কত পরিমাণ নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	চর্ব্বি	কার্ব্বো হাইড্রেট	প্রোটিড	খনিজ পদার্থ	জল
গম	২·১৮	৭০·৯২	১২·২৪	২·২৪	১১·৮৩
যব চূর্ণ	৭·৩	৬৯·৪	১৪·২	১·৯	৭·২
বার্লি	২·২	৭৩·৩	১০·০	২·৬	১১·৯
চাউল	০·৮	৭৮·৮	৬·৮৬	১·৩২	১১·৫
ভুট্টা	৫·৪	৭০·৯	৯·৭	১·৫	১২·৫

অন্য সকল রবিশস্যের তুলনায় ভুট্টাতে চর্ব্বীভাগ বেশী এবং লবণ ভাগ কম। চাউল শ্বেতসারে পূর্ণ কিন্তু তাহাতে যবক্ষার জনিত কোন দ্রব্য, চর্ব্বি এবং খনিজ পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যবচূর্ণ, চর্ব্বি ও প্রোটিড পরিপূর্ণ এবং সকল রবিশস্যের মধ্যে ইহাই খুব পুষ্টিকর।

গম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। গম হইতে আমরা তিন প্রকার জিনিস প্রাপ্ত হই। ময়দা তরল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়, সূক্ষ্ম পদার্থের অপেক্ষাকৃত মোটা আবরণ হইতে আটা তৈয়ার হয়, আর অপেক্ষাকৃত মোটা তৃতীয় আবরণ হইতে সুজি প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় পুষ্টিকর।

বঙ্গদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহা আমাদের প্রধান খাদ্য। বহু

প্রকারের চাউল এখানে জন্মিয়া থাকে। আমাদের এখানে যে সকল চাউল পাওয়া যায় তাহাকে আমরা "দেশী" চাউল বলিয়া থাকি এবং তাহা 'বর্ম্মা চাউল' হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মদেশের চাউল ভাল হয় না, তাহা একেবারে কলে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়, সুতরাং তাহাদের দুইটা আবরণ বাহির হইয়া যায়। তাই দেশী চাউল অপেক্ষা বর্ম্মা চাউল কিছু আকারে ছোট। সিদ্ধ চাউলে বীজকোষ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বর্ম্মা চাউলে তাহা থাকেনা, সেইজন্য বর্ম্মা চাউল প্রোটীড ও খনিজ পদার্থ বিশেষ ফসফরাস শূন্য।

সমস্ত বীজ খাদ্যের মধ্যে তণ্ডুলে প্রোটীড (protied), চর্ব্বি (fat) ও খনিজ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় থাকে। তণ্ডুলে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার (starch) থাকে বলিয়া ইহা বিরস। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যবক্ষার জনিত দ্রব্য যথা দাল, মাছ, ঘৃত, প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। তণ্ডুল পুরাতন হওয়া আবশ্যক, নূতন চাউলে পেটের পীড়া হয় এবং ইহা দুষ্পাচ্য।

যব খুব পুষ্টিকর ও খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে যবক্ষার জনিত পদার্থ ডিমের শ্বেতাংশের আকারে বর্ত্তমান।

নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে দাল যবক্ষারবহুল পদার্থ। দাল প্রোটিডবহুল বলিয়া ইহা শ্বেতসার বহুল দ্রব্যের সহিত অর্থাৎ চাউলের সহিত খাইতে হয়। দালে পটাস লবণ (salt of potash) চূণ ও গন্ধক থাকে। দালের উপাদান :—

নাম	প্রোটিড	কার্ব্বোহাই	চর্ব্বি	জল	খনিজ পদার্থ
মটর	২১·০	৬১·৪	১·৮	১৩·০	২·৬০
কলাই	২২·৫৮	৫৮·০২	১·১০	১০·৮৭	৩·৬১
মুগ	২৩·৬২	৫৩·৪৫	১·৬৯	১০·৮৭	৩·৫৭
ছোলা	১৯·৯৪	৫১·১৩	৪·৩১	১০·০৭	৩·৭২
অরহর	২১·৬৭	৫৪·২৭	৩·৩৩	১০·০৮	৫·৫০
মসূর	২৫·৪৭	৫৫·০৩	৩·০০	১০·২৩	৩·৩৩

আলু অধুনা সর্ব্বত্র প্রচলিত। আলু আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ, আলু ব্যতীত আমাদের একদণ্ড চলে না। আলু না থাকিলে আমরা ব্যঞ্জন কিরূপে পাইতাম তাহা বলা যায় না, কারণ তরি তরকারী বড়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। আলুতে নানাপ্রকার লবণ

থাকে, তজ্জন্য ইহা কতকগুলি রোগীর পক্ষে উপকারী। যবক্ষার জনিত দ্রব্যের সহিত আলু ব্যবহারে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। ইহাতে নাইট্রেড অব পটাস থাকে। নূতন আলু অপেক্ষা পুরাতন আলু আশু-পাচ্য।

কাঁচা শাকসব্‌জিতে শতকরা ৯০ ভাগ জল ও যবক্ষার ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত থাকে। চর্ব্বি ইহাতে বড়ই কম, সুতরাং ঘি বা তৈল পক্ক করিয়া ইহা খাইতে হয়।

কার্ব্বোহাইড্রেট বহুমূত্র রোগে অপকারী, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলিতে উক্ত পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং বহুমূত্র রোগীর পক্ষে উপকারী। ফুলকপি সব চেয়ে সুপাচ্য এবং অম্লরোগীর পক্ষে উপকারী। শসা দুষ্পাচ্য, বেল বড় উপকারী। পেটের ব্যারামে বেলের সরবৎ ও বেলের মোরব্বা খুব উপকারী, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

শরীর পুষ্টিসাধনে আঙ্গুর অতি উপকারী,

নাম	প্রোটীড্	চর্ব্বি	জল	কার্ব্বোহাই	খনিজ-পদার্থ
বাঁধাকফি	১.৮	০.৪	৮৯.৬	৬.৯	১.৩
ফুলকফি	২.২	০.৪	৯০.৭	৫.৯	০.৮
শসা	০.৮	০.২	৯৫.৪	৩.১	০.৫
বেগুন	০.৮৯	০.৯৪	৯৩.৯৮	৩.৪৮	০০.২৬
কলা	১.৩	০.৬	৭৫.৩	২২.০	০.৮
বিলাতী-কুমড়া	০.৯০	১.০	৯৩.৪০	৩.৯৬	০.৭

আঙ্গুরের রসে চিনি, বাইট্রেট্ অব পটাস্ (bitrate of potash) টার ট্রেট অব লাইম (titrate of lime) ম্যালিক য়্যাসিড (malic acid) এবং জল থাকে, বৃদ্ধের পক্ষে আঙ্গুর খুব উপকারী। শুষ্ক আঙ্গুরকে কিসমিস বলে, তাহা আঙ্গুর অপেক্ষা দুষ্পাচ্য।

আম অতিশয় পুষ্টিকর ফল। উদরের খারাপ অবস্থায় খাইলে কঠিন উদরাময় রোগ জন্মায়।

নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি ফলে কার্ব্বোহাই ড্রেট অংশ অতিশয় কম আছে, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহারা খুব পুষ্টিকর ফল, কিন্তু সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত)।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—(১) ঘন দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমিত ছানা মিশাইয়া খাইলে ১ বার উত্তমরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (২) এক তোলা মৌরী বাটা এক গ্ল্যাস মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকীর গুঁড়া, আমলকীর গুঁড়া, সোনামুখীর গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ—এই কয়েটি দ্রব্য ৶১০ সাড়ে তিন আনা ওজনে লইয়া গরম জলের সহিত রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রাতে উত্তমরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা, মৌরীর গুঁড়া চারি আনা, সোণামুখীর গুঁড়া চারি আনা, গোলাপ ফুলের দলের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া লইয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ এবং মিছরির গুঁড়া ১ ভাগ শীতল জলের সহিত রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করিলে প্রাতঃকালে তিনবার ভেদ হইয়া থাকে। (৫) সোণামুখী ৷৹ তোলা, রেউ চিনি ৷৹ তোলা, জাঙ্গী হরীতকী ৷৹ তোলা ও সোঁদাল ফলের আটা আধ তোলা—আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার অর্দ্ধেক ফেলিয়া দিয়া বাকী অর্দ্ধেকটি কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায়।—(১) অপরাজিতা ফুলের পাতার রসের নস্ত লইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (২) আকন্দের আটায় ঘুঁটের ছাই মিশাইয়া কাদার মত করিয়া শুকাইয়া নস্ত লইলে অনেক গুলি হাঁচি হইয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৩) নিশাদল—কলি চুণের সহিত মিশাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৪) কর্পূর—শ্বেতচন্দনের সহিত ঘসিয়া লইয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৫) কুলের পাতার উল্টা পিঠে কলিচুণ মাখাইয়া রগে বসাইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৬) কদম্বের নূতন পাতা মাথায় মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

দন্তরোগে।—(১) আকন্দের আটা ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে মিশাইয়া শুকাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। (২) পাঁপড়ি খদির ১ ভাগ, তুঁতে পোড়া ১ ভাগ, কাঁচা শুপারির শাঁস পোড়ান ১ ভাগ, হরীতকীর গুঁড়া ১ ভাগ, বহেড়ার গুঁড়া ১ ভাগ, ও আমলকীর গুঁড়া ১ ভাগ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্ত রোগ প্রশমিত হয়। (৩) পাঁপড়ি খদির এবং তাহার সিকি পরিমাণ কর্পূর মিশাইয়া জল দিয়া কাদার মত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তশূল ও দন্ত বেদনা প্রশমিত হয়। (৪) নাগেশ্বরের মূল ১ ভাগ ও আদা ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (৫) জাতী ফুলের পাতা ১ ভাগ, পুনর্ণবা ১ ভাগ, গজ পিপুল ১ ভাগ, ভেরেণ্ডার শিকড় ১ ভাগ,

কুড় ১ ভাগ, শতমূলী ১ ভাগ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত রোগ আরোগ্য হয় এবং দন্ত বজ্রের মত শক্ত হয়। (৬) বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনার স্থানে রাখিলে বেদনা প্রশমিত হয় এবং নড়া দাঁত শক্ত হইয়া থাকে। (৭) সিউলীর মূল বাটিয়া দন্তে লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

পোড়াঘায়ে।—জ্বালা দীপ শিলে ঘসিয়া ঐ মাটি দিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্যে।—(১) আহারের পূর্ব্বে আদার কুচি সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া নিত্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (২) প্রাতঃকালে শুঁঠের গুঁড়া এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিয়া একটু গরম জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (৩) যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয় তাহা হইলে হরীতকীর গুঁড়া, শুঁঠের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত প্রত্যূষে সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণে।—ঘৃত খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে লেবুর রস খাইলে উহা প্রশমিত হয়। কাঁঠাল খাইলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে কলা খাইলে উহা আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঘৃত খাইলে আরোগ্য হয়। নারিকেল এবং তাল শাঁস খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে চাউল ভক্ষণে আরোগ্য হয়। আম্র খাইয়া অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ পানে প্রশমিত হয়। ময়দা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে শসা ভক্ষণে আরোগ্য হয়। খেজুর এবং কয়েদবেল খাইয়া অজীর্ণ হইলে নিম্ববীজ খাইলে প্রশমিত হয়। তণ্ডুল খাইয়া অজীর্ণে গরম জল পান হিতকর। মটর খাইয়া অজীর্ণ হইলে হরীতকী সেবনে প্রশমিত হয়। লবণ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে চাউলধোয়া জল হিতকর। জল পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মধু সেবনে উপকার হয়। পিষ্টক আহারে অজীর্ণ হইলে গরম জল পান করিবে। জাম খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঁঠ সেবনে প্রশমিত হইবে। মালপুয়া এবং বড়া ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যমানি সেবন হিতকর। বেগুন এবং মূলা ভক্ষণে অজীর্ণ রোগে বৃহতীর ক্বাথ পান করিলে প্রশমিত হয়। শাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে সরিষা বাটা সেবনে আরোগ্য হয়। ওল খাইয়া অজীর্ণ হইলে গুড় ভক্ষণে ভাল হয়। তরকারী খাইয়া অজীর্ণ নাশের জন্য তিলের গাছ পোড়াইয়া উহা জলের সহিত মিশাইয়া সেবনে আরোগ্য হয়। দুগ্ধ পানে অজীর্ণে কুস্কুম, চিঁড়া ভক্ষণে অজীর্ণ নিবারণে পিপুলের গুঁড়া ও কুস্কুম এবং যষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকের জন্য দধিমন্থ প্রশস্ত। খিচুড়ি—সৈন্ধব লবণে, মাংস—লেবুতে এবং মুগের যূষে পায়স পরিপাক করে।

বিষ চিকিৎসা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ)

সর্প দংশনে।—সর্প দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলী উপরে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর দংশিত স্থান চিরিয়া একটি ছোট গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জ্বালিয়া ক্ষত মুখে সেই গেলাসটি চাপিয়া ধরিয়া রক্ত নির্গমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার পর এক খণ্ড লৌহ অগ্নি সন্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া ক্ষত স্থান দগ্ধ করিবে। দংশিত স্থান যদি বাঁধিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলেও চিরিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় রক্তমোক্ষণের চেষ্টা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করিবে। যদি বিষ সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তুঁতের জল বা অন্য বমন কারক ঔষধ সেবনে বমন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের কথা।—(১) ৮।১০টি গোল-মরিচের সহিত হুড়হুড়ের মূল জলে পিষিয়া সেবন করান হিতকর। (২) অপরাজিতা ও হাপরমালীর কাথ পান করান সর্পবিষে উপকারক। (৩) মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের শুঙ্গার কাথ পান করান সর্পবিষে প্রশস্ত ব্যবস্থা। (৪) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, সিউলি ছোপ ও কটকী—এই সকল দ্রব্যের সমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা, জল ৵৷৹ আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করানর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (৫) হাতীশুঁড়ার মূল ও ভুঁই চাপার মূল সেবনে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

নস্য প্রয়োগ।—(১) ঈশলাঙ্গলার মূল জলে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রয়োগ সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থেয়। (২) বিষাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর রোধ হইলে বার্ত্তাকু, হোলঙ্গ লেবু এবং কট্‌কী পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—দংশিত স্থানে তার্পিণ তৈলের মালিশ উত্তমরূপে করিতে থাকিবে এবং তালপাতার আগুন করিয়া বারম্বার সেঁক দিবে। গাওয়া ঘি ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া দংশিত স্থানে মাথাইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। গোময় গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। কাল কচুর আটা মর্দ্দন করিলে এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দর্শে। চূণ গরম করিয়া দিলেও বৃশ্চিক-বিষে উপকার হয়। চিটে গুড়ের প্রলেপও বৃশ্চিক বিষ প্রশমনে উপকারক।

মূষিক বিষে।—সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির মত প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করান আবশ্যক। তাহার পর ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব লবণ সমানভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া হিতকর। আকন্দের মূল পিষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে। দারুচিনি ও শুঁঠের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য।০ আনা মাত্রায় লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করানও এ অবস্থায় প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা।

মাকড়সার বিষে।—(১) অপরাজিতা অর্জ্জুন ছাল, কুড়, শেলু অশ্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞ ডুমুর ও বেতস ছাল—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই কাথ পান করাইলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা মূল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরি, সিউলিছোপ শিরীষ, বালা ও অনন্ত মূল—এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগ এবং কুড় ৩ ভাগ—একত্র শেলু বৃক্ষের রসের সহিত পিষিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

শৃগাল ও কুকুরের বিষে।—শৃগাল বা কুক্কুরে দংশন করিবামাত্র দংশিত স্থান চিরিয়া রক্ত নির্গমনের ব্যবস্থা করিবে, এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ ধুতুরার মূল ১ রতি অথবা কুঁচিলার মূল ১ রতি ও খানিকটা গব্য ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে এ অবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পুরিয়া সেবন করানও এ অবস্থায় হিতকর।

শোষক কার্পাস।

(The Absorbent Cotton)

[অভিনব প্রণালীতে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলন-প্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লীতে প্রদর্শিত]

—:*:—

(শ্রীপ্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত)

চিকিৎসা শাস্ত্রে 'কার্পাস' এবং তজ্জাত বস্ত্রাদির অনেকস্থলে ব্যবহার দেখিতে পাই। মহাত্মা ধন্বন্তরি সুশ্রুতোক্ত অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার অস্ত্র ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি সহ পিচু (তুলা) প্লোত সূত্র ও পট্ট ইত্যাদির সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছিন্ননাসা, ছিন্ন ওষ্ঠাদি যাবতীয় শল্য চিকিৎসায়ও কার্পাসের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই কার্পাস কিরূপ এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রীয় ব্যবহার বিধিগুলির আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অস্ত্র ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্ষতের আর্দ্রতা পরিশোষণজন্য, কষায়াদি বস্ত্র ও বিকেশিকা প্রস্তুতার্থ প্রতিসারণীয়—ক্ষারকর্ম্মে ক্ষরিত রক্ত পূযাদি শোষণ করণার্থ এবং ব্রণ বন্ধনে যাহাতে বন্ধন শিথিল বা সঙ্কুচিত না হয়—অথচ তাহার কোমলতা বিদ্যমান থাকে, বনমক্ষিকা মশা তৃণ, প্রস্তর খণ্ড, ধূলি এবং শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা ক্ষতস্থান কোন প্রকারে দূষিত না হইতে পারে—অপিচ অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতি-পাতিতাবস্থায় কিম্বা শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি ছিন্ন হইলে তাহাদিগকে স্বস্থানে স্থিতকরণার্থ

শল্যতন্ত্রোক্ত কার্পাসের ব্যবহার বহুপ্রকারেই দেখিতে পাই।

উপরি লিখিত কার্পাসের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কার্পাস বিশেষ উপাদানে শোষকগুণ বিশিষ্ট রূপে প্রস্তুত। স্বাভাবিক কার্পাসে যে পরিমাণে শোষক শক্তি বিদ্যমান আছে—তাহাতে ক্ষতাদির বন্ধন পক্ষে উহা সম্যক উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেহেতু উপযুক্তভাবে শোষণ গুণ যুক্ত না হইলে উহা কদাপি লেপাদি ঔষধ ক্ষতার্দ্রতা ও রক্ত পুয়াদির শোষণ কার্য্য করিতে অথবা কোমল হইতে পারে না।

অতএব শোষণ গুণযুক্ত শোষক কার্পাসই শল্য চিকিৎসার একটী প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা ধাত্রী চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ও ব্রণাদির প্রতিকারার্থ যাবতীয় বর্ত্তি, পিচু, বিকেশিয়া, দুকূল, ও ব্রণবন্ধনী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তৎ সমস্তই শোষণ গুণ যুক্ত ও উত্তম আবরক হইয়া থাকে।

ব্রণ হইতে রক্তপূয়াদি আকর্ষণ করিয়া, অভ্যন্তরে পূয়োদপাদক বীজাণু প্রসারের হ্রাস করা এবং বহির্দ্দেশ হইতে শীত, বাত, আতপ, বীজাণু ও ধুলি ইত্যাদি আগন্তুক উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এই জন্য ইহা প্রদাহে অগ্নি কর্ম্মে, ক্ষারকর্ম্মে,বিসর্পে অন্যান্য ক্ষতাদি স্থানে, বীজাণুশূন্য এবং বীজাণু নাশক কষায় সিক্ত করিয়া আবরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অপতন্ত্র, ফুসফুসাদি যন্ত্রের প্রদাহে, উরঃক্ষতে, শীত, বাত, এবং আতপ হইতে রক্ষাকরণার্থ বক্ষ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি পীড়িত স্থান ইহার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়।

অধুনা প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে দ্রব করিয়া তদ্বারা ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, এষ্য, আহার্য্য ও সিব্য ক্রিয়োৎপন্ন ক্ষত উত্তমরূপে আচ্ছাদন করা যাইতেছে।

এই শোষণ গুণযুক্ত কার্পাস প্রাকৃতিক কি বৈকৃতিক তাহা আমরা সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষজাত বীজ রহিত কার্পাস জলে নিমজ্জিত করিলে দেখিতে পাই,কার্পাস খণ্ড জলে ভাসিতে থাকে জল শোষণ করে না। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, স্বভাব জাত কার্পাসে শোষণ শক্তি উপযুক্ত ভাবে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত 'শোষক কার্পাস, জলে স্থাপন করিবামাত্র দেখা যায় যে, তন্মুহূর্ত্তে জল কার্পাসের প্রত্যেক স্তরে স্তরে এবং উর্দ্ধস্থিত সুক্ষ্ম তন্তু পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অতি সত্বরই উহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে।

এই কারণে প্রমাণ হয় যে,—আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মারা শল্য চিকিৎসায় যে কার্পাসাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা শোষণ গুণ বিশিষ্ট ও যে বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাও উক্ত কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত হইত এবং কার্পাসকে শোষকরূপে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া তাঁহাদের বিশেষ ভাবে জ্ঞাত* ছিল, অথচ সেই তত্ত্ব আজ আমাদের নিকটে অজ্ঞাত।

আমরা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে

* এই প্রবন্ধের লেখক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দিল্লীর সম্মেলনের প্রদর্শনীতে যে, শোষক কার্পাস প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই ছাত্রেরই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। এই "শোষক কার্পাস" অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। আঃ সং

অধ্যয়ন করিয়া পদার্থ বিশ্লেষণ শাস্ত্রে (chemistry) সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কার্পাসে স্নেহযুক্ত এমন একটী পদার্থ বিদ্যমান আছে—যাহার দ্বারা কার্পাসে জল শোষিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই তৈলাক্ত পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে কার্পাস শোষকগুণবিশিষ্ট এবং কোমল ও শস্ত্র ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

মহিলাদিগের মৃত্যু।—কলিকাতায় মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ—গত বৎসর কলিকাতায় পুরুষদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩১·৬ এবং মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৪। ইহার মধ্যে বসন্ত রোগে পুরুষ মরিয়াছে—হাজার করা ৫৪, মহিলা মরিয়াছে ৭৪; হামে পুরুষ ১১, মহিলা ২৪; ইনফ্লুয়েঞ্জায় পুরুষ ৪·৩, মহিলা ৫; ম্যালেরিয়ায় পুরুষ ৯৭, মহিলা ১·৯; আমাশয়ে পুরুষ ২·৫, মহিলা ৪·৯; যক্ষ্মারোগে পুরুষ ১·৬, মহিলা ২·৯; ফুসফুস্ রোগে পুরুষ ৭·৭, মহিলা ৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় মহিলাদিগের মধ্যে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের পীড়াই প্রবল ভাব ধারণ করায় গত বৎসর অধিক সংখ্যক মহিলা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় ইহার যে কয়টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আলোক-রৌদ্রহীন-ঘরগুলিতে অন্তঃপুরচারিণীদিগের অবস্থিতির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত। আমরা অনেক বারই বলিয়াছি—অনেক প্রবাসী চাকুরে পুরুষের আয়ের পরিমাণ অল্প হইলেও পুত্র কলত্র লইয়া কলিকাতা বাসের সাধ মিটাইতে গিয়া সামান্য কদর্য্য বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। ফলে কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদিগকে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের পুরস্ত্রীগণের জন্য আলোক-রৌদ্র উপভোগের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী মহিলার স্বাস্থ্য এইরূপেই ক্ষয়িত হইতেছে। অল্প আয়ের বাঙ্গালী পুরুষ: এসব কথা যে বুঝেন না—ইহাই তো দুঃখ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব।—মহিলাদিগের মত কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুর সংখ্যাও ভীষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। গত বৎসর কলিকাতায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় মোট ৫০৯৬টি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৭৯১টি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। গত বৎসর যতগুলি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহার তিনভাগের ১ ভাগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে বা ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ভাবের

মৃত শিশুর মোট সংখ্যা ১৭৯১, ইহাদিগের মধ্যে ৫৯৫টি শিশু অপূর্ণাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ৭৬৯টি শিশু দুর্ব্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ৩৯৫টি শিশুর ধাত্রীর দোষে ধনুষ্কারে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণ।

শিশুমৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জন্মের ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কলিকাতায় ৮৩২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এক কথায় কলিকাতায় যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে,তাহার অর্দ্ধাংশ এক মাসের মধ্যেই কাল কবলিত হইয়া থাকে। ৭ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। গত বৎসর যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩৮৫টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে দ্বিতীয় মাসে। এই ৩৮৫টির মধ্যে ২৬৫টির ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর জন্মগ্রহণের পর ২৬৫টি শিশু তৃতীয় মাসে ব্রঙ্কাইটিসে এবং ৩ হইতে ৬ মাস বয়সের মধ্যে ২১২টি শিশু ঐ রোগে মারা গিয়াছে। এই হিসাবে ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শিশুর মাসিক মৃত্যু সংখ্যা ১১৬। গত বৎসর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৬ হইতে ১২ মাসের প্রতি মাসে গড়পড়তা ২০১টি শিশু কাল কবলিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রতি মাসে ৯০টি। গত বৎসর ৯৮৭টি শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর কারণ।—ফলকথা শিশুমৃত্যুর অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইহার উপায় চিন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে কলিকাতায় মহিলা মৃত্যু বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিশু মৃত্যুর কারণও তাহার সহিত বিজড়িত। বাঙ্গালীকে উদরান্নের সংস্থানের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহার অনুপাতে বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বাঙ্গালী-মহিলার অবস্থা আরও শোচনীয়, একে আলোক রৌদ্রহীন কক্ষমধ্যে দিবারাত্রি অবস্থিতি, তাহার উপর চিরন্তন রীত্যনুসার বাঙ্গালী পুরুষকে যথাসাধ্য আহার করাইয়া ভুক্তাবশেষ ভোজনে আত্মতৃপ্তি অনুভূতির ফলে অনেক মহিলাই উপযুক্ত ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখেন না! ফলে বাঙ্গালী-পুরুষও যেরূপ দুর্ব্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মহিলা তাহা পেক্ষাও স্বাস্থ্যহানির কারণ করিয়া তুলিতেছেন। কাজেই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের সংমিলনে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা যে এরূপ ভাবে অকালে কাল কবলিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা।—সহযোগী "হিন্দুস্থান" হইতে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা নিম্নলিখিত খোকা খুকীদের কথা উদ্ধৃত করিলাম।

১। শিশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া কখনো চুমো খাইবেন না—বা আর কাহাকেও খাইতে দিবেন না।

২। বাজার হইতে কিনিয়া আনা কৃত্রিম স্তনবৃন্ত শিশুদের মুখে দিয়া কখনো তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। শিশুদের বাড় ইহাতে কমিয়া যায়; গঠনও খারাপ হইবার ভয় আছে।

৩। কি দিনে, কি রাতে, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক নিয়ম করিয়া শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইয়া দিবেন।

৪। প্রতিবারের আহারের পরেই বোরিক অ্যাসিড দিয়া শিশুদের মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার।

৫। দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না।

৬। শিশুর পিছনে এক হাত না রাখিয়া কখনো তাহাকে কোলে করিবেন না।

৭। যতক্ষণ পারেন,—শিশুকে খোলা জায়গায় শোয়াইয়া রাখিবেন। খোলা বাতাসে শিশুর বাড় বাড়ে।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

সুশ্রুত।

—:*:—

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ।)

(১)

নিখিল ভুবন আবৃত যখন নিবিড় মোহের তমসা স্পর্শে।
তখন উজল জ্ঞানের আলোক ছাইল সারাটা ভারতবর্ষে॥
তাহার মাঝারে সুশ্রুত দেব! দানিলে বিশাল ভিষকতন্ত্র।
প্রতিভা প্রকাশি' অন্তেবাসীরে বিতরি শতেক শল্য যন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(২)

জনক তোমার অতি তেজস্বী তপোধন মুনি বিশ্বামিত্র।
কৈশোরে তব জ্ঞানের আলোকে-উজলিল হৃদে সে শালিহোত্র।
জনক আদেশে জ্ঞানের প্রয়াসে বারাণসী ধামে পুণ্যক্ষেত্রে।
বরিলে নৃমণি দেব দিবোদাসে আচার্য্য পদে সুদেব পুত্রে॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৩)

বিতরিল গুরু শতেক শিষ্যে সমান বিদ্যা সমান জ্ঞান।
উচ্চে উঠিলে সবার মাঝারে গুণ গৌরবে লভিলে মান॥

ব্রহ্মা রচিত আয়ুর শাস্ত্র তোমাতে লভিল সমুৎকর্ষ।
রচিলে স্বনামে গ্রন্থরত্ন শিষ্য সমাজে ফুটা'লে হর্ষ॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৪)

শবচ্ছেদি দিলে শারীরের জ্ঞান শিখা'লে সকলে যন্ত্র শস্ত্র।
এষণ সীবন লেখনাহরণ ছেদন ভেদন বেধন অস্ত্র॥
তিব্বতে তব ঘোষিল কীর্ত্তি মিশরে উঠিল যশের মন্ত্র।
আরব ঘোষিল অতুল মহিমা তবানুসরণে রচিল তন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

কাজের কথা।

বাঙ্গালীর কথা।—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর পরমায়ু গড়পরতা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পর অনেক বাঙ্গালীরই অধিকাংশ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে না। বাঙ্গালীর মধ্যে যেরূপ উপচক্ষুর বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহাতে যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে অনেক বাঙ্গালীরই যে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিয়া থাকে—ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। সেই চক্ষুর দোষ ঘটার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর শরীর ক্ষয়। চক্ষুর দোষ ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে, যে কোনো কারণেই হউক অল্পদৃষ্টি-বাঙ্গালীর শারীরিক ক্ষয় ঘটিতেছে। বাল্যে বা যৌবনে যাহাদিগের উপচক্ষু ধারণ করিবার কারণ ঘটে, আমাদের মনে হয়, নিয়ত পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলির প্রতি চক্ষুর দৃষ্টি সুসংবদ্ধ থাকাই তাহার প্রধান কারণ। বাঙ্গালী বালক মূর্খ হউক—তাহার অধ্যয়ন করিয়া কাজ নাই—এ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ইদানিন্তন কালের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিবারাত্রি রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় চক্ষুর দোষ জন্মাইবার কারণ উপস্থিত করাও সমীচীন কিনা—তাহাই চিন্তার বিষয়।

* * * *

উপচক্ষু বিস্তৃতির হেতু।—শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন আর একটি কারণে বাঙ্গালী বালক ও যুবক সমাজে উপচক্ষু-

বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে—সে টি ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যতগুলি কারণে চক্ষুর দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অতিমৈথুন—চক্ষুর দোষ উৎপন্ন করিবার একটি প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালী-বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ইহার গতি কিন্তু রোধ করিবার উপায় নাই। তাহার উপর যেরূপমৈথুনে চিরদিনের জন্ম অন্তঃসারশূন্য হইতে হয়, সেই অস্বাভাবিক মৈথুনের ব্যবস্থাই উহাদিগের মধ্যে অপ্রতিহত। ইহার ফলে বাঙ্গালী বালকের চক্ষুর দোষ তো ঘটিতেছেই, তদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভীষণ পীড়নে কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

* * * *

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সর্ব্বনাশ।—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে যত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল নিবারণের ঔষধে পূর্ণ। বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থা ঐ সকল বিজ্ঞাপনের অবস্থা দেখিয়াই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। রোগের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বুঝিয়া দেশে যে ঐ শ্রেণীর ঔষধের আবিষ্কর্ত্তারাও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। ফলে এখনকার দিনে বাঙ্গালী-বালকের নিকট যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রতীকার কি? সে কালের শিক্ষাকাল গুরুগৃহে অতিবাহিত করায় ব্যবস্থা তো অধুনা লুপ্ত হইয়াছে,—যেরূপ শিক্ষার স্রোত এখন বাঙ্গালায় প্রবাহিত, তাহারই মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ কি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দানের কোনো একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ইহার বন্দোবস্ত কিরূপভাবে হইতে পারে—শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন, তবে আমাদের মনে হয়,—স্বাস্থ্য পালনের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্য-গণিতের মত যদি একটু কড়াকড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বাস্থ্যপালনের সেই সকল পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি সকল লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কতকটা শুভ ফল ফলিতে পারে।

* * *

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য।—এখনকার বাঙ্গালী বালককে যে একেবারেই চিত্ত সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয় না—ইহা অতি সত্য কথা। বাঙ্গালী-বালকের অধ্যয়ন ব্যাপারে তাহার পিতামাতা যেরূপ কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাহাকে সংযমী করিবার জন্য যদি তাহার কতকটা দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজি বঙ্গজননীর অনেক কৃতীপুরুষকে অকালে কাল কবলিত হইতে হইত না। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যেও এখনকার দিনে পনের আনা বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকেন। অধিক জলপান, বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা অসময়ে ভোজন) মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রি জাগরণ—সাধারণতঃ এই কয়টি কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। বাঙ্গালার পল্লীগুলি অপেক্ষা সহর গুলিতেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রাদুর্ভাব অধিক, আবার বাঙ্গালার সকল সহর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতাতেই ইহার বিস্তৃতি অত্যধিক। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে চা-সোডা-লেমোনেড-সরবতের দোকান নাই,—ফিরিওয়ালা "চাই বরফ" বলিয়া সেখানে সর্ব্বদা হাঁকিয়া যায় না, কুলপী বরফ সেখানে সন্ধ্যার পর বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারই ফলে

পল্লীমাতার সন্তানগণ নাগরিকগণের মত এত অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যপ্রবণ হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে পারেন না। সহরে বাঙ্গালী পিতা নিজেই এইরূপ অধিক জলপানে অজীর্ণগ্রস্থ হইবার কারণ করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী-বালককে সে বিষয়ে চিত্ত সংযম করিবার শিক্ষা কে প্রদান করিবে? ফলে বাঙ্গালী প্রতি নিয়ত রোগের তাড়নায় ক্রমেই যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে কবি রামপ্রসাদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়ঃ—

"কারো দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * *

বাঙ্গালীর পরমায়ু।—অনেক বাঙ্গালীই যে এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বাঁচেনা এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিক্রম করার পর হইতেই তাহার যে জীবনের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইয়া থাকে—ইহা পৃথিবীর সকল জাতির লোকেই একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। বিলাত ও আমেরিকার জীবন-বীমা কোম্পানী গুলি তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রসার কল্পে বাঙ্গালী জাতির বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী যদি মৃত্যুর পর টাকা প্রদানের সর্ত্তে বীমা করিবার জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, সেরূপ বয়সে দশ কি উর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর পরে জীবদ্দশায় টাকা গ্রহণের সর্ত্তে অধিক চাঁদা দিয়া বীমা করিতে হয়। আর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বীমা গ্রহণের আবেদন করিলে তাহা তো গ্রহণ করার ব্যবস্থাই নাই। ফলে বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু এখনকার দিনে গড়পরতা যে পঞ্চাশ,—ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।— সেকালের বাঙ্গালী আশী-নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তো বাঁচিতই—একশত এবং তদূর্দ্ধ বয়সেও বাঁচিয়া থাকার লোকও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমাজের নিয়মে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেও পত্নী বিয়োগে বাঙ্গালীর নূতন করিয়া দার পরিগ্রহে বাধা নাই। অনেক অশীতিপর স্থবিরকেও সেই নীতির মর্য্যাদা পালন করিতে দেখা যায় এবং দারান্তর গ্রহণের ফলে তাঁহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ অধিক দিন জীবিত থাকিবার ক্ষমতা লাভ করিতেন, সেইরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেন না। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন—তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনই তাহার এক মাত্র কারণ। অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যের নাম সে কালে বাঙ্গালী একেবারে জানিত না। এখনকার সৌখিন-বাঙ্গালী আহার করিতে পারে না—ভোজ-নিমন্ত্রণে আহূত বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত অল্পাহারী—তিনি তত ধন্যমনা বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আগেকার বাঙ্গালী তো সেরূপ ছিল না। আগেকার বাঙ্গালীকে মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় যে অন্ন প্রদান করা হইত, তাহার পরিচয়ে বলিতে গেলে বলিতে হয়—ঐ অন্নদ্রব্য মার্জ্জার বা বিড়ালে ডিঙ্গাইতে পারিত না। সেকালের আহারপটুবাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নিন্দার কথা ছিলনা, বাঙ্গালীর আহারপটুতা সে কালের একটা গৌরবের বিষয়ই ছিল। ভোজ-নিমন্ত্রণে

যিনি যত বেশী আহার করিতে পারিতেন, তিনি তত বেশী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিতেন। বাঙ্গালীর 'মুনকে রঘু'—এই আহারপটুতার ফলে আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ফলে সেকালের বাঙ্গালী বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত, যৌবনে স্বভাবতঃ শরীর ক্ষয়ের কারণ ঘটিলেও তাহার পূরণ কামনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিত,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ-ব্যবস্থাও সর্ব্বপ্রকারে মানিয়া চলিত। সেকালের বাঙ্গালীর নীরোগ, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান থাকিবার তাহাই একমাত্র কারণ।

* * *

এ কালের বাঙ্গালী।—এ কালের বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য শিখে নাই, সদাচার করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সদ্‌বৃত্তি সে পাইবে কোথা হইতে? যে সকল আহার্য্যে শরীরের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে সেই দুগ্ধ ঘৃত তো দেশে একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তা'ছাড়া সে সকল দ্রব্য আহারের জন্যও বাঙ্গালী এখন আর উদ্‌গ্রীব নহে। বাঙ্গালীর বল সঞ্চয় হইবে কোথা হইতে? বলসঞ্চয় ভিন্ন দীর্ঘজীবন লাভ তো একেবারেই অসম্ভব। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালীর ভাগ্যে যে সকল আহার্য্য জুটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে না থাকে দুগ্ধ, না থাকে ঘৃত, না থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য! ছাত্রজীবনে অনেক বাঙ্গালীকেই মেসে বা বোর্ডিংয়ে থাকিতে হয়, ইহাদিগের ভাগ্যে বিশেষ পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ সম্ভবপর নহে, যে সকল অল্প বেতনের চাকুরে বাঙ্গালী সপরিবারে সহরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেও ঐ একই ব্যবস্থা। গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আহার তো এইরূপ, দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও এখনকার দিনে প্রচুর আহার করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা অতিশয় শ্রমবিমুখ। পরিশ্রম না করিলে তো ক্ষুধাকালে যথেষ্টরূপে ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না। ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যথেষ্টভাবে উদরপূর্ত্তির অভাবে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ হইয়া স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছেন, আর দেশের ধনবানেরা আলস্য-পরতন্ত্রতার ফলে বয়সোচিত আহারের অভাবে ঐ রোগের কারণ ঘটাইতেছেন।

* * *

পরিণাম।—ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে ইহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল নাই, বল না থাকিলে সে বুদ্ধির স্ফূরণ হওয়া কখন সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালীর প্রাণ আছে, কিন্তু উৎসাহ নাই, উৎসাহ না থাকিলে সে শুষ্ক প্রাণ লইয়া কোনো বিরাট ব্যাপারে একাগ্রতার অভিনিবেশের আশা করা যায় না। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা অশান্তিপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের চেষ্টা কখনো সফলকাম হইতে পারে না। বলবুদ্ধি, প্রাণের উৎসাহ এবং হৃদয়ের শান্তি—এই কয়টি জিনিসের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। বাঙ্গালীর এখন সেই মনুষ্যত্ব নষ্টের উপক্রম ঘটিয়াছে। ইহারেই ফলে বঙ্গজননী আর "প্রতাপাদিত্যের" মত সন্তানপ্রস্থ নহেন, "আশানন্দ-বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের" মত প্রথিত নামা সন্তানকে আর বঙ্গজননীর অঙ্কে ধারণ করিতে হয় না। স্বাস্থ্যহীনতার ভীষণ ফলে সে 'রামপ্রসাদের' মত সাধক, 'কীর্ত্তিবাস' 'কাশীরাম' 'ভারত' ''চণ্ডী-

দাসের' মত কবিত্ব লইয়াও বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না, 'টেকচাঁদ' 'বঙ্কিম' 'দীনবন্ধুর' স্থানও পূরণ করিবার শক্তি এইজন্য বাঙ্গালা হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

* * *

ব্যবস্থার কথা।—আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" এখনকার দিনের অর্থসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সে কথা বোঝেনা বলিয়াই তো আজি তাহার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে নষ্টস্বাস্থ্য প্রায় বাঙ্গালীর পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে সেকালের মত আবার সাবেক রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। বাল্যে গুরুগৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা না হইলেও ছাত্রগণ বাল্য-জীবনেই যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধনবানদিগকে শ্রমবিমুখ হইলে চলিবে না,—শারীরিক শ্রমের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ অল্প বেতনের চাকুরেগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে যে সহরে অবস্থিতি করেন, সে সংকল্প পরিহার করিতে হইবে। চাকরির নেশা পরিত্যাগ করিয়া যদি পল্লীজননীর প্রান্তর ভূমিতে কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তো কোনো কথাই নাই, তাহা না হইলেও সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া সকলেই অর্দ্ধাশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার সুলভ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। সকল খাদ্য অপেক্ষা দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। দরিদ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান কারণ দুশ্চিন্তা। দরিদ্র-বাঙ্গালী যদি অবস্থা মত ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এই দুশ্চিন্তা-রাক্ষসী বাঙ্গালীর নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ন করিবে, ফলে বাঙ্গালী আবার সেকালের মত নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইবে।

* * *

দুশ্চিন্তার কারণ।—বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর সর্ব্ব বিষয়ে অভাব, সেই অভাবটা যেন বাঙ্গালীর নিকট ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, কারণ চাউলের মূল্য দশ টাকা, বাঙ্গালী শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী বসন পরিতে পায় না, কারণ সাধারণ কাপড় একজোড়ার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ টাকা। ইহার উপর দরিদ্র বাঙ্গালীর উপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা পূর্ণ মাত্রায়। কাজেই বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সারাদিনে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা নিজের এবং পরিবারবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে অশন বসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে, কাজেই দুর্ব্বল মস্তিকে তাহাকে দুশ্চিন্তা-রাক্ষসীকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকা চলে না। ইহার উপর সমাজের কঠোর ব্যবস্থায় কন্যাদায়ে সকল বাঙ্গালীই জর্জ্জরীত। একে উদরান্ন সংস্থানের চিন্তা, তাহার উপর কন্যাদায়ের ভয়ঙ্করী চিন্তা! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হানি হইবে না—তথা বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটিবেনা তো ঘটিবে কাহার? হায়! অর্থ উপার্জ্জনের অসচ্ছলতার এই দারুণ দর্দ্দিনে বাঙ্গালী-পিতা সঙ্গতিহীন-পুত্রের বিবাহ সংঘটনের পূর্ব্বে যদি এই কথা চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ তো এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইত না। কিন্তু কোনো বাঙ্গালীই এ কথা বুঝেন না, সেই জন্যই তো বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:o:—

গ্রন্থ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম্, এ, এল্, এম্ এস্)

চরক সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান প্রামাণিক সংহিতা সমস্ত কায়চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত—এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ বশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি উহার প্রতিসংস্কার করেন। এই জন্য উহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। চক্রপাণি রচিত "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" নাম্নী চরকটীকার সূত্রস্থানাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গভূমি-ভূষণ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ রচিত "জল্পকল্পতরু" নাম্নী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য ভেল কর্ত্তৃক রচিত। ভেল সংহিতা পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাঞ্জোরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে।

হারীত সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্ত্তৃক রচিত। বর্ত্তমানে হারীত-সংহিতা নামে যাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে কোন অজ্ঞাত-নামা অল্পবিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—এই শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ, বর্ত্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদান-স্থানে প্রধানতঃ শস্ত্রসাধ্য (Surgical) ব্যাধি সমূহের নিদান এবং চিকিৎসা স্থানে ঐ সকল

রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অন্যান্য সাতটী তন্ত্রের বিষয়ীভূত রোগ সমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (Hygiene) এবং পঞ্চকর্ম্ম বিষয়ক উপদেশও উত্তরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থকারের মত, এমন কি চরকের পাঠ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এরূপে বিদেহ প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা যাহা সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহা মূল সুশ্রুত-সংহিতা নহে। উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতি-সংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত বচন "বৃদ্ধ সুশ্রুতের" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতের ডল্লন কৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ" নাম্নী সমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কৃত "ভানুমতী" টীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দুর্ল্লভ এরূপ অন্যান্য মূল সংহিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(খ) সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্ব্বেদের সমগ্র অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই বুঝায়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ে কেবল সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করিব। আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি "বিবিধ সংগ্রহ" তালিকার মধ্যে লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ বা বাগ্‌ভট—ইহা বাগ্‌ভট কৃত উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহ-গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসা স্থান, কল্পস্থান ও উত্তর স্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদের আটটী তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং গদ্যপদ্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষণে বম্বে প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট—অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ রচনার পরে বাগ্‌ভট ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্‌ভট এই নাতি-সংক্ষেপবিস্তর গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাপথে ও উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গহৃদয়কে সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহ—ইহা শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয় বিভাগ রমণীয় ও বিশিষ্ট প্রকার। শার্ঙ্গধর প্রণীত শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক সাহিত্য সংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (উপবন বিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর সংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম ভারতে অধিকতর দেখা যায়। শার্ঙ্গধরের সময় পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

গদনিগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ সোঢ়ল কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্রয়োগ খণ্ডে ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র প্রভৃতি আটটী তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। গদনিগ্রহে অনেক প্রাচীন সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব-

নিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য গদ-নিগ্রহ—মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গসেন বা চিকিৎসাসংগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্ত্তৃক রচিত এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থসমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগ-প্রণালী সংহিতা গ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও, এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্গসেনের অন্যান্য পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যোগরত্নাকর—ইহা কোন অজ্ঞাত-নামা সুবিজ্ঞ বৈদ্য রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। দক্ষিণাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষ-রূপ আদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণ পদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এজন্য ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ য়ুরোপীয়দিগের ভারত বর্ষে আগমনের পরে রচিত বলিয়া ফিরঙ্গ (Syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে। অহিফেন, তোপ-চিনি প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের প্রয়োগ—সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেরও দুই একটী ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়। ভাবমিশ্রের পরিচয়াদি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(গ) রসগ্রন্থ।

রসরত্নাকর—(১) নাগার্জ্জুন রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ। এই নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রসরত্নাকর—(২) নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা,—রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়ন-খণ্ড এবং মন্ত্রখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্র খণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থমালায় * মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসরত্নসমুচ্চয়—বাগ্‌ভট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্‌ভট যে অষ্টাঙ্গ-হৃদয়কার বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ—শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব—মাধবকর এবং সায়ণ মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনাথ, নিত্যনাথ প্রভৃতি যোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্ত্তী,

* বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ অনেক রসগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য বৈদ্যমাত্রেই ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অন্যান্য রসতন্ত্র-সংগ্রহকারদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশে রসের এবং অন্যান্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বলিয়া রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

রসহৃদয়তন্ত্র—শঙ্করাচার্য্যের ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পাদাচার্য্য বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় চতুর্ভুজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

রসার্ণবতন্ত্র—লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন রসগ্রন্থ।

রসেন্দ্র কল্পদ্রুম—নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসেন্দ্র চিন্তামণি—এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ—গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। অন্য দেশে ইহার প্রচার নাই। ইহাতে ধাত্বাদির জারণ-মারণ বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রসপ্রকাশ সুধাকর—ইহা যশোধর নামক গৌড় দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতি বৃহৎ রসগ্রন্থ। ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার ও রসবন্ধ এবং সর্ব্বধাতু জারণ মারণ ব্যতীত হেম রৌপ্যাদি-করণ বিধিও বর্ণিত আছে।

রসফলক—রুদ্রযামলের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ধাত্বাদির শোধনজারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

রসকৌমুদী—ভিষক্ মাধব প্রণীত। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাধব—নিদানকার মাধবের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

রস চন্দ্রিকা—নীলাম্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ।

রস চিন্তামণি—অনন্তদেব সুরি বিরচিত রসগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস নক্ষত্র মালিকা—মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস পদ্ধতি—শ্রীবিন্দু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস মঞ্জরী—শালিনাথ কৃত রসতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস প্রদীপ—উত্তম রসগ্রন্থ। ভাবমিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রসযোগ মুক্তাবলী—নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরত্নমালা—নিত্যনাথকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরাজ মহোদধি—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস রাজলক্ষ্মী—বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসরাজ সুন্দর—রসতন্ত্র বিষয়ক অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস সঙ্কেত কলিকা—চামুণ্ড কায়স্থ বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

রসসার—গোবিন্দাচার্য্য বিরচিত রস-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (Alchemy) বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোবিন্দাচার্য্য গুর্জ্জর দেশবাসী এবং শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রস সারামৃত—রামসেন কৃত রসতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণ তন্ত্র—অন্য ধাতু হইতে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

কাকচণ্ডীশ্বরী মত তন্ত্র—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডীশ্বরী ও ভৈরবের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

বৈদ্য বৃন্দ—নারায়ণ কৃত রস গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

(ঘ) নিঘণ্টু গ্রন্থ।

নিঘণ্টুর অন্য নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতা সমূহে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বলিয়া বিস্তৃত নিঘণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিঘণ্টুর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু—কাশিরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। তাঁহার কোন্ শিষ্য ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা জানা যায় না। সংগ্রহকার এই নিঘণ্টুকে দ্রব্যাবলি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু—কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই নিঘণ্টুর রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিঘণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল নিঘণ্টু এখন পাওয়া যায় না। মদনপালনিঘণ্টু মধ্যমাকারের উত্তম নিঘণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিঘণ্টু—এই উৎকৃষ্ট নিঘণ্টু নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে কাশ্মীর দেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ধন্বন্তরি-নিঘণ্টু, মদনপাল নিঘণ্টু, হলায়ুধ নিঘণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টু, অমরকোষ এবং শেষরাজনিঘণ্টু প্রভৃতি হইতে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী, কিন্তু চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—চক্রপাণি এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটী মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিঘণ্টু—এই নিঘণ্টু রাজবল্লভ বৈদ্যের রচিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোঢ়ল নিঘণ্টু—সোঢ়ল কৃত বিস্তৃত নিঘণ্টু-গ্রন্থ। বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রত্নমালা—মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

এই সকল নিঘণ্টু ব্যতীত চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়প্রদীপ, মুদ্গল-কৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, কেয়দেব কৃত কেয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু, কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি বহু নিঘণ্টু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীনকালে বহু দেশীয় এবং অনেক ভারতীয় য়ুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয় ভেষজ দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)।

কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা।

——:০:——

পক্ষাঘাতে—গুড়ূচ্যাদি তৈল।

(ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এম, এস)

মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া কর্ম্মময় জীবনে বহু কাল হইতে আমি ডাক্তারী চিকিৎসাই করিয়া আসিতেছি। সত্য কথা বলিতে হইলে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করার পর হইতে কবিরাজী চিকিৎসার উপর আমার ততটা আস্থা ছিল না। অনেক সময় ভাবিতাম, এখনকার কবিরাজেরা শারীর-বিদ্যা শিক্ষা করেন না, এজন্য শারীরস্থানের কোনো খবরই তাঁহারা অবগত নহেন, একমাত্র নাড়ী দেখিয়াই তাঁহাদের কৃতিত্ব। তাঁহারা বলেন, "বায়ু, পিত্ত, কফের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারা যায়।" আমি ডাক্তার, বায়ু-পিত্ত-কফের খবর রাখি না, কাজেই বক্ষঃস্থল পরীক্ষা না করিয়া, জ্বরে টেম্পারেচারের গতি না বুঝিয়া, কেবল বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া কিরূপে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয় অর্জ্জন করিতে পারা যায়—তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতাম না। অনেক কবিরাজকে অনেক সময় হাতুড়ে বা quake জ্ঞানে এজন্য বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে পারিতাম না।

সংপ্রতি একটি বিশেষ ঘটনায় আমার সে বদ্ধ ধারণা যেরূপে অপনোদিত হইয়াছে, তাহারা পরিচয় দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমার জ্যেষ্ঠসহোদর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ই, বি, রেলের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহাকে সিলংয়ে কর্ম্মভার লইয়া গমন করিতে হইল। পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ অসুখে ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সে সময় তত ভাল ছিল না। যাহা হউক সিলংয়ে গমন করিবার কিছুকাল পরেই টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার কর্ম্মস্থানে গমন করিলাম এবং ৬ মাসের জন্য ছুটীর ব্যবস্থা করাইয়া

চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আনয়নের পর আমার আত্মীয়বন্ধুদিগের অনেকে পরামর্শ দিলেন—"এ সকল রোগে কবিরাজী চিকিৎসাই বিশেষ ফলপ্রদ, অতএব তাঁহার চিকিৎসার ভার কোনো উপযুক্ত কবিরাজের হস্তে অর্পণ করা হউক।" আমি কিন্তু সে কথা মানিতে পারিলাম না,—বহুকাল হইতে হাসপাতালের চাকরির কল্যাণে নানাপ্রকারের অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য করিয়া আমার এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা কখনই আশু ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলে দাদার চিকিৎসা অ্যালোপাথিক চিকিৎসকের হস্তেই ন্যস্ত করা হইবে সাব্যস্ত হইল এবং শ্রীযুক্ত আর, এল, দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহারই হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল।

দাদার তখন রোগের অবস্থা শুধু পক্ষাঘাত নহে, তাহার সহিত জ্বরও হইতেছিল। একেবারে উত্থান শক্তি রহিত, তাহার উপর বড় দুর্ব্বল।

দত্ত সাহেব কিন্তু তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আধা-কবিরাজী আধা-ডাক্তারী। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য একটি সেবনের ঔষধ দিলেন,—সেটি অ্যালোপাথিক সম্মত এবং মালিশের জন্য ব্যবস্থা করিলেন—কবিরাজী সম্মত "গুড়ূচ্যাদি তৈল।" আমি এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ ব্যবস্থা তো যে সে লোকের নহে, এখনকারদিনের একজন প্রাচীন ও বহুদর্শী অ্যালোপাথিক চিকিৎসক স্বয়ং দত্ত সাহেবের,—সে ব্যবস্থা উল্টাইবার সাধ্য আমার নাই। ফলে দত্ত সাহেবের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের বিশেষ সংসৃষ্ট আমাদের একজন বন্ধু কবিরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

কবিরাজ আগমন করিলেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুড়ূচ্যাদি তৈল আছে?" তিনি বলিলেন,—"আছে।" আমি আপাততঃ এক পোয়া তৈল পাঠাইয়া দিতে বলিলাম, তিনি উহা পাঠাইয়া দিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি—চারি পাঁচ দিন ঐ তৈল ব্যবহার করানর পরই দাদার জ্বর বন্ধ হইয়া গেল, পক্ষাঘাতের অসহ্য কষ্টও যেন অতি অল্প মাত্রায় কমিয়া আসিতে লাগিল বলিয়া উপলব্ধি হইল। আবার দত্ত সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, তিনিও রোগীর অবস্থা সন্দর্শনে প্রীত হইলেন।

ঐ ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। উপকারও প্রতিদিনই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এমনই করিয়া ঠিক এক মাসে দাদা নিরাময় হইলেন।

ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজীর উপর আমার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল এই সময় হইতে তাহা বিদূরিত হইল। আমি এখন আর কোনো চিকিৎসারই বিপক্ষ নহি।

ইহার কিছুকাল পরে কবিরাজী পুস্তকে "গুড়ূচ্যাদি তৈলে"র প্রস্তুত প্রণালী ও গুণ-পরিচয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। উহার গুণ-পরিচয়ে অবগত হইলাম, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডুতা, বিস্ফোট, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চিকা, গাত্রকণ্ডূ, পাদদাহ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই তৈল বিশেষ কার্য্যকারী। এই

তৈল ব্যবহারে বলীপলিত নষ্ট হয় এবং বল বৃদ্ধি ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। মহর্ষি আত্রেয় এই তৈলের আবিষ্কর্ত্তা।

এই তৈলের গুণ-ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকার যে সকল রোগ নিবারণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, দাদার রোগ তো সে ধরণের হয় নাই। দাদার রোগ হইয়াছিল পক্ষাঘাত, কিন্তু গুড়ূচ্যাদি তৈলের গুণ-পরিচয়ে জানিতে পারা যায়, ইহাতে সাধারণতঃ বাতরক্ত নষ্ট করিবার শক্তিই সঞ্চারিত। তবে "হনুস্তম্ভ" নামক বাতব্যাধিও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষাঘাত বলিলে তো শুধু হনুস্তম্ভই বুঝায় না। এজন্য ইহার প্রভাবে এত বড় একটা রোগ কেমন করিয়া সারিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

একজন বিজ্ঞ কবিরাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"বায়ু—পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করে,—এরূপ অবস্থায় গুলঞ্চে যে পিত্তনাশিনী শক্তি যথেষ্ট রূপে বর্ত্তমান, তাহা হইতে তো শুভ ফলেরই আশা করা যায়। তাহার উপর তৈল মাত্রেই বাতনাশক, বিশেষতঃ তিল তৈলের বাতনাশকতা শক্তি অধিক। দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধেক ভাগকে আক্রমণ ও তন্ত্রাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষ পূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিরই নাম তো একাঙ্গ রোগ বা পক্ষাঘাত। এরূপ অবস্থায় তৈলে সাধারণতঃ বায়ু নষ্ট করিবার শক্তি যথেষ্ট বর্ত্তমান, তাহার উপর গুড়ূচির সংমিশ্রণে দুষ্ট বায়ু ও কুপিত পিত্ত উহাতে প্রশমিত হইয়াই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্যের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, গুড়ূচ্যাদি তৈল আয়ুর্ব্বেদে বাতরক্ত অধিকারোক্ত তৈল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহাতে অনেক রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।"

আমি জ্ঞানবৃদ্ধ-কবিরাজ মহাশয়ের এই যুক্তি শ্রবণে আশ্চর্য্য হইলাম এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিদিগের জ্ঞান-গভীর-গবেষণার ফল সম্ভূত এই সকল মহৌষধ আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

চ্যবন প্রাশের পুরাবৃত্ত।

—:*:—

এখনকার বিজ্ঞাপন মাহাত্ম্যে এবং সুলভ মূল্যের কৃপায় যে "চ্যবন প্রাশ" ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত, আমাদের পাঠকমণ্ডলীকে তাহার একটু পুরাবৃত্তের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পুরাকালে 'শর্য্যাতি' নামক এক প্রবল

পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 'সুকন্যা' নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সেকালে রাজকুমারীদিগের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত, সেইজন্য ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিলে তখনও সুকন্যার অনূঢ়াকাল উত্তীর্ণ হয় নাই।

রাজা শর্য্যাতি অনূঢ়া ষোড়শী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। এক নিবিড় অরণ্যাণীর মধ্যে রাজা যখন মৃগয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় সুকন্যা দেখিলেন, বনবিটপির একতম দেশে একটি বল্মীকাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে দুইটি তিমির পটলাবৃত নেত্র তারা শোভা পাইতেছে। রাজকুমারী এই অভূতপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শনে কৌতূহলপরবশা হইয়া ঐ নেত্র তারা দুইটির মধ্যে একটি কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

মহামুনি 'চ্যবন' যোগ সমাহিত হইয়া বহুকাল অতিক্রম করায় এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বল্মীক কর্তৃক তাঁহার সমস্ত দেহ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেবল চক্ষু দুইটি মাত্র বহিঃপ্রদেশে প্রকাশ পাইতেছিল। সুকন্যা তাহাতেই শলাকা বিদ্ধ করিলেন, ফলে "চ্যবনে"র ধ্যান ভগ্ন হইল এবং উগ্রতপা ঋষি সুকন্যাকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইলেন। রাজা এই ঘটনা অবগত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ঋষির ক্রোধ শান্তির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ঋষির ক্রোধ প্রশমিত হইল না।

সেকালে কন্যাদান একটি প্রধান দান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনকার মত সেকালে কন্যাদানকালে পণ পীড়ণে কাহাকেও ঋণগ্রস্ত হইয়া চিন্তাসর্ব্বস্ব হইতে হইত না। কন্যাদান প্রাপ্তি ঘটিলে গৃহীতা ধন্যমনা হইত।

রাজা শর্য্যাতি ঋষি-ক্রোধ-প্রশমনের যখন কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না, তখন সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করিয়া তাঁহার কোপানল হইতে কন্যাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা দান করিলেন, চ্যবন গ্রহণ করিলেন। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলী সাক্ষী হইলেন, পবন উল্লসিত হইয়া সে বারতা সমগ্র রাজ্যে জানাইয়া দিল, পুলকে বিহগকুল কাকলীর তানে দিগন্তে ছুটাইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। এমনই ভাবে অশীতিপর বৃদ্ধ চ্যবনের গলায় এক ষোড়শী অলোকসামান্যা সুন্দরী রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা কন্যাকে বনে রাখিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজকন্যা বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চ্যবন ঋষি হইয়াও আবার গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, সুকন্যা অলোকসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে সে সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনাকুমারদ্বয় সেই রূপরাশি সন্দর্শনে সুকন্যার সৌন্দর্য্য সুধা পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা তাঁহারা সুকন্যাকে একাকী পাইয়া মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী সেই কুপ্রসঙ্গ উত্থাপনে শিহরিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদিগের সামর্থ্য প্রকাশের প্রয়াস পাইলেন, সুকন্যা ভীতি কম্পিতা হইয়া পিতৃসম্বোধনে তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ফলে সুকন্যার স্তব স্তুতিতে স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহারা চিত্তসংযমে সমর্থ

হইলেন এবং সুকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে অভয় দান পূর্ব্বক 'বর' গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুকন্যা জানিতেন, পতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, সুতরাং পতির জীবন স্বাস্থ্যবান দেখিলেই তিনি সর্ব্ব সুখী হইবেন। তাই স্বর্গ-বৈদ্যদ্বয়কে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহার স্বামী অশীতি বর্ষ বয়স্ক ঋষি চ্যবনকে নব যৌবন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। সুকন্যা ইহা ভিন্ন অন্য বর কামনা করেন না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, তাহাই হইবে, এই বলিয়া "আমলকী রসায়ন" প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুকন্যাকে নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলিয়া শুদ্ধিভাবে সেই "আমলকী রসায়ন" চ্যবনকে সেবন করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় অশীতি বৎসর বয়স্ক মুনিপুঙ্গব চ্যবন নব যৌবনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতে এই "আমলকী রসায়নে"র নাম করণ হইল "চ্যবনপ্রাশ" এবং সেই চ্যবন প্রাশই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম করিতে, শরীরের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

'চ্যবন প্রাশে'র পুরাবৃত্ত বলা হইল। এই বার এই চ্যবনপ্রাশের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

শাস্ত্রকারগণ এই ঔষধের ফলশ্রুতি উপলক্ষে ইহাকে প্রথমেই 'রসায়ন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহার পর নানারূপ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য গুণের বিষয় না বলিয়া কেবল মাত্র ইহাকে শ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিলেও ইহাকে নানাবিধ গুণ সম্পন্ন মহৌষধ স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্রবেত্তারাই বলিয়া গিয়াছেন, রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

"দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয় বলং কান্তি নর বিন্দেদ্রসায়ণাৎ॥"

অর্থাৎ রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, আরোগ্য তাহার নিত্য সহচর হয়, তাহাকে তরুণ বয়স্ক পুরুষ বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, বল এবং কান্তি যথেষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় 'চ্যবন প্রাশ' সেবনে মানব যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি হইতে পারে তাহা সুনিশ্চয়।

কিন্তু আমরা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি বহুকাল এই শাস্ত্রীয় 'চ্যবন প্রাশ'কে মহৌষধ জ্ঞানে সেবন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কোনো ফলই প্রাপ্ত হন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—সেই স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের কল্পিত "চ্যবন প্রাশ" সস্তার প্রলোভনে অধুনা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এখনকার দিনে বিজ্ঞাপনের বাজারে চারি টাকা, তিন টাকা—এমন কি আড়াই টাকা মূল্যেও ইহা বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা চ্যবন প্রাশ" সেবনে কোনো ফল নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা ঐ শ্রেণীর সস্তার "চ্যবন প্রাশের"ই খরিদদার। সস্তার দুরবস্থার প্রসিদ্ধি চিরদিনই চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গ বৈদ্যের আবিষ্কৃত "চ্যবন প্রাশ"ও সেইজন্য আজি ব্যর্থগুণসম্পন্ন।

আমরা এই প্রসঙ্গে "চ্যবন প্রাশে"র

উপাদানগুলির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সমস্ত উপাদানে সযত্ন প্রস্তুত "চ্যবন প্রাশ" অতি সস্তায় কেমন করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব —সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বেল ছাল, গনিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগাণী, মাষাণী, পিঁপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা কিসমিস, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুথা, পুনর্ণবা, মেদ, ছোট এলাইচ, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, ভূমি কুষ্মাণ্ড, বাসকের মূল, কাঁকোলী, কাকনাসা—এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকটি ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা করিয়া লইবে। সমুদয় দ্রব্য একমণ চব্বিশসের জলে সিদ্ধ হইবে। আমলকী ৫০০ শত লইবে। ঔষধের রস জলের সহিত উত্তম-রূপে মিশিয়া গেলে আমলকীগুলি তুলিয়া আঁটি ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী দ্বাদশ পল পরিমিত ঘৃত ও তিল তৈলে ভাজিয়া সেই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত বেল ছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া ছয়সের মিছরির সহিত পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া তাহাতে ৬ পল মধু, চারি পল বংশ লোচন, পিঁপুলের গুঁড়া ২ পল এবং দারু-চিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা ও নাগকেশর —ইহাদিগের গুঁড়া এক পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে।

যাঁহারা সস্তার 'চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই ঔষধ প্রস্তুতে সামান্য ব্যয় হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই হিসাবে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের খতিয়ানও দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকার ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহে বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রশস্ত দেশ সম্ভূতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্য গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্॥
ঔদ্ভিজ্জম পরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং পরমং মতম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্প পরিমিত, মহাবীর্য্য সম্পন্ন এবং গন্ধবর্ণ ও রস বিশিষ্ট অর্থাৎ কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতুপ্রভৃতি যথা সময়ে প্রয়োগ করিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায়।

এ অবস্থায় প্রশস্ত দেশ হইতে প্রশস্ত ভেষজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া যদি বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া অতি সস্তায় ইহা বিক্রয় করা যাইতে পারে— তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা মাটীর দামে ইহা বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন সাহায্যে ঢক্কা নিনাদে কর্ণ পটাহ ঝালাপালা করিয়া তুলিতেছেন,— প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিবার জন্য তো তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না, 'চ্যবন প্রাশ' সেবনের উপযুক্ত কাল কিনা তাহাও তাঁহাদিগের বিচার করিবার বড় দরকার হয় না, বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করিলেই তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল!

ইহার উপর "চ্যবন প্রাশে'র প্রধান উপা-দান সকল সময়ে সুলভ নহে। কার্ত্তিকের প্রারম্ভ হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমলকী পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যাঁহারা অতি সস্তায় চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং বার মাস সমান ভাবে প্রচুর পরিমাণে

বিক্রয় করিয়াও যাঁহারা খরিদদার ফেরান না, তাঁহারা যে অনেক সময় শুষ্ক আমলকীর গুঁড়ার সাহায্যেও ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন না—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যাইবে! একে চ্যবনপ্রাশের কয়েকটি দ্রব্য বহু আয়াস করিয়াও অধুনা কোনো-চিকিৎসকই সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাহার উপরও যদি ইহাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সে চ্যবন প্রাশ সুফল প্রদ হইবে কোথা হইতে?

চ্যবন প্রাশে ঘৃত ও তিল তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ঘৃত শব্দে গব্য ঘৃত বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেই গব্যঘৃত এখনকার দিনে কিরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিল তৈলের দরও আগের মত সুলভ নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা কেবল ঔষধ বিক্রেতা নামে অভিহিত নহেন, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সস্তার চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাই কি ঠিক নহে? চ্যবন প্রাশে'র গুণ ও বীর্য্য একবৎসর পরেই নষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহারা একবৎসর উত্তীর্ণ হইলেই বীর্য্যহীন 'চ্যবন প্রাশ' ফেলিয়া দিয়া থাকেন। এজন্যও ইহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়া কখনই সম্ভব পর নহেন।

বিলাতী "কড্‌লিভার অয়েল" অপেক্ষা আর্য্য চিকিৎসার গৌরবের ঔষধ 'চ্যবন প্রাশ' যে অধিক কার্য্যকারী—এ কথা এখনকার দিনে অনেক বড় বড় ডাক্তারেরাও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু সস্তার আড়ম্বরে সেই প্রত্যক্ষ ফল প্রদ ঔষধের গুণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়াই এত কথা বলিলাম।

রস বিজ্ঞান।

ভূমিকা।

(ভারতে তান্ত্রিক যুগ, পারদের আবিষ্কার)

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

সে অনেক দিনের কথা।

মহা ভারতের মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে; "নারী পর্ব্বের" অশ্রু ধারায় সিক্ত হইয়া, বীর বৃন্দের চিতাচুল্লী—দীপান্বিতার আলোক মালার মত, নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে!

বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, ক্ষত্রিয় বীর আর অগ্রসর হয় না! আর্য্য-সমাজ বিশৃঙ্খল। বল-দৃপ্তা বীর-ধাত্রী ভারত ভূমি—বহু শতাব্দি ধরিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের মোহময়ী বিস্মৃতি। যজ্ঞক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পশুর করুণ

আর্ত্তনাদে, ভূলোক দ্যুলোক গোলক পর্য্যন্ত বিচলিত। হিংসাময়ী ধরণীর রক্তসিক্ত ধূলিকণার উপর পরম পূজ্য বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। জাতি বিচারের তিরোধান।

তাহার পর, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা দেবত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, "এসিয়ার আলোক"—সাধক সিদ্ধার্থের মহা নির্ব্বাণ। সমাজ আবার উচ্ছৃঙ্খল! বোধিসত্ত্ব—তাঁহার মহাসাধনার শীলধর্ম্ম হইতে "ঈশ্বরকে" নিরাকৃত করিয়াছিলেন,—প্রেম-প্রতিমা রমণীকে মুক্তি-পথের অন্তরায় ভাবিয়াছিলেন;—এইবার সেই সুদারুণ কঠোরতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেদ-পন্থার চির বিরোধী—উদার সাম্য "সদ্ধর্ম্ম" ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া পড়িল। রাজা মন্ত্রির হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া মন্থর পদ-ক্ষেপে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী, অলক্ত রাগ-রঞ্জিত বাম চরণের পেলবস্পর্শে—রক্তাশোক বীথির প্রাণ সঞ্চার করিয়া, "প্রমোদ বনে" পুষ্প শয্যা বিছাইয়া, অন্তর বিজয়ীকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঘরে ঘরে "মদনোৎসবে" কুসুমায়ুধের পূজা চলিতে লাগিল। বার-বনিতা বধূর' সম্মান পাইয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া, শুদ্ধান্তের শোভা বর্দ্ধণ করিল। বারুণী ও তরুণীর সেবায়—সংযমী শ্রমণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে, উদ্দাম-ইন্দ্রিয়ের মরুময়ী বুভুক্ষায়—দেশ যখন মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় বিড়ম্বিত, তখন আবার নূতন অঙ্কের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। কুমারিল, অলর্ক, শঙ্কর, যামুন,—নভোনীলিমার মাঝে ভাস্বর শুকতারার মত একে একে ফুটিয়া উঠিলেন! মহত্ত্বের মহাশ্মশানে, মহেশ্বরের আশীরুত্তোলিত কল্যাণকর হইতে, দিগন্ত ব্যাপী জড়ের অঙ্গে প্রাণ স্পন্দন করিয়া পড়িল! নূতনত্বের পুলক-ব্যাকুলতা বক্ষে লইয়া, হোম হবি সুরভি ব্রাহ্মণ্য—শ্লথ-তন্দ্রায় জাগিয়া উঠিয়া বজ্রকণ্ঠে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেন! বহু বৌদ্ধচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া, কামিনী কাঞ্চন-কাদম্বরীর বিজয় ঘোষণার জন্য—জিঘাংসাময়ী তান্ত্রিকতা—অহিংসার শান্ত তপোবনে আপনার আসন পাতিয়া লইল।

বিজেতা ব্রাহ্মণ্য ক্ষমাশীল ছিলেন না। প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তিনি মঠ ভাঙ্গিলেন, চৈত্য ভস্মীভূত করিলেন; বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস-মূর্ত্তি—"শিব দুর্গায়" রূপান্তরিত হইল। "মার" এর সহোদর গোষ্ঠী—প্রেত পিশাচের আকার ধারণ করিল। পঞ্চ 'ম' কারের প্রবল তাড়নায়—সত্যভ্রষ্ট "সংঘ" নির্ব্বাণের পথ দেখিল! বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ—"যদি প্রকৃতির হাত এড়াইতে চাও—তবে রমণী পরিত্যাগ কর"। তন্ত্র বলিলেন—"জীবনের দুইটী কেন্দ্র—একটী পুরুষ, অপরটী প্রকৃতি, একটী উদাসীন—অন্যটী প্রবর্ত্তক। পুরুষ চিদাধার—স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি; অতএব রমণীকে জননীত্বে পরিণত কর; তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" নির্ব্বাণের দার্শনিকতা ও জড়োপসনার চেয়ে এ যুক্তি—অনেকেরই ভোগাবিল জীবনে সার্থক বলিয়া মনে হইল। নাগভট্ট প্রমুখ প্রবুদ্ধাচার্য্যের দল—কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে—উদয়ন রামানুজের জলন্ত প্রতিভার প্রভায় হৃত সর্ব্বস্ব ও পরাজিত হইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে গোপন অপরাধের তপ্তশ্বাস ফেলিলেন। রক্ষকের অভাবে—বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল সিন্ধুগর্ভে—প্রাণহীন, বায়ু হীন, আলোক হীন, অতলে, ক্ষীণপুণ্য-বৌদ্ধ দর্শন চিরদিনের জন্য সমাহিত হইল!

এইবার তান্ত্রিক মঠে জড়াত্মিক বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুসন্ধান চলিল। রসায়ন-তন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারে—"রুদ্র যামলের এক একটী অধ্যায় হিরণ্ময় হইয়া উঠিল। কল-মুখরা কেদার বাহিনী তটে—রক্তাম্বর পরিহিত ভস্ম-ধূসর তান্ত্রিক, তিমির কুটিলা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে—প্রকৃতির আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। স্তব্ধ ধ্যানের আসন্ সম্মুখে—জলন্ত কুণ্ডে "বজ্র মুষা" স্থাপিত হইল। অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানে তান্ত্রিক নারী রহস্যের মর্ম্ম বুঝিলেন। পুরুষ অনুপ্রাণয়িতা, নারী—বশবর্ত্তিনী শক্তি; পুরুষ সন্ন্যাস—নারী সৃজন কারিণী;—পিতৃ অংশে পুরুষ কেবল জীবনের উন্মেষক, নারী কিন্তু সে জীবনের সঞ্চয়িকা, জীব নারী হইতে জন্মগ্রহণ করে, নারী লইয়া সংসারী হয়, নারী সংসর্গে—মৃত্যু কালিমায় মাটিতে মিশিয়া যায়। পুরুষ ও নারী—এই উভয় কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্য্য—শারীরিক ধাতু সর্ব্বদাই ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন শীল। সেই ধাতু ক্ষয় নিবারণের অমোঘ উপায়—রসাদি ধাতুর রহস্য নির্ণয়। নৈশ সাধনার ফলে তান্ত্রিক সপ্তধাতুর বীর্য্য পরীক্ষা করিলেন। ভারতে রস-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইল। বিজ্ঞানের ভীম-কান্ত প্রভাব, স্ফুরদ্দাম বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত নরলোকের লোমহর্ষ উৎপাদন করিল। "সুক্ষ্লারের বায়ো কেমিকেম রেমিডি" ভূমিষ্ট হইবার বহুযুগ পূর্ব্বে—ভারতে স্বর্ণাদি ধাতুর সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল। বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক হইয়া গেল। পারদের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-পানে, সাধন-ছুল্ল ভ দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, নতজানু তান্ত্রিক বিশ্ব দেবতাকে প্রণাম করিবেন;—

"ধরা পোইগ্নি মরুদ্ব্যোম মহেশেন্দর্ক মূর্ত্তায়।
সর্ব্ব ভূতান্তরস্থায় পারদায় নমো নমঃ॥

পারদ ও তন্ত্রের ইহাই অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তন্ত্র পারদকে জগৎস্রষ্টার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে পারদকে এত বড় করিয়া আর কোন জীবন্ত বিজ্ঞান ভাবিতে পার নাই। তন্ত্রের মহোজ্জল মহিমায়—রমণী বা প্রকৃতির ভিতর দিয়া, আজ আমরা "রস-বিজ্ঞান" বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"পারদ"—বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় আছে। তন্মধ্যে—সূত 'চপল" "রস" "হরবীর্য্য"—এই নাম গুলিই রস-গ্রন্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক "হরবীর্য্য', পারদের সার্থক সংজ্ঞা। যিনি পারদ-রহস্য বুঝিতে পারেন, সৃষ্টি ও বিনাশের প্রহেলিকা কখনও তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে না।

একদিকে দ্যুতি রতি বিস্তৃতি, অন্য দিকে নুতি তমিস্রা সংহৃতি—ইহাই পারদের ক্রিয়া। তাই পারদ "হরবীর্য্য";—হর তমোগুণ, সংহার মূর্ত্তি—বৈশ্লেষিক পাক (Destrudtive metabolism)—অতএব পারদ এক রকম মরণেরই শুক্র কীটাণু। পারদের অবৈধ প্রয়োগে বা আময়িক শক্তির (Puthogenetic property) প্রভাবে—জীব দেহস্থ ধাতু উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হর—আদি পুরুষ, জগৎ-পিতা; মূল প্রকৃতির স্বামী। পারদ তাঁহার বীর্য্য—সুতরাং জীবনের উন্মেষক, জীবনী শক্তির নিতান্ত সাত্ম্য।

পার্ব্বতী—মূল প্রকৃতি—শারীর ক্ষেত্রে বৃংহনী শক্তি (Consbructive metabolism) পিতৃ অংশে প্রাণ, মাতৃ অংশে দেহ। পিতৃ অংশ বৈশ্লেষিক, মাতৃ অংশ সংশ্লেষিক; পিতৃ অংশ প্রলয়কারী, মাতৃ অংশ সৃষ্টিকারিণী। তন্ত্রে

—"হরিতালের" নাম পার্ব্বতীর তেজ। অবৈধ পারদ যখন শরীর ধ্বংস করে, হরিতালে তাহা পুনর্গঠিত হইতে পারে। পারদ মৃত্যু শুক্র—ধ্বংসকারী,—একথা যদি সত্য হয়, তবে আবার সেই পারদকে জীবনের বা জৈবী-শক্তির প্রধান সহায় বল কেন? তন্ত্রই এ রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলিয়াছেন,—জীবন, মরণের সহায়; মরণ জীবনের সৃষ্টি কর্ত্তা। দুইটী সীমান্ত মরণের ব্যবধানের নাম "জীবন"। এই ব্যবধান লইয়াই মনুষ্য-জন্ম। "জীবনের" আর একটী অর্থ চিন্তন; 'জীবন'—অনুভূতি রূপে অনাস্বাদিত বিষয়ের আস্বাদনে প্রমত্ত, তাই 'জীবন' এক হইতে বহুতে বিসর্পিত হইবার ইচ্ছা করে। আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া, সেই সৃষ্টির নবীনতায় আত্মাকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা 'জীবনের প্রথম কার্য্য।" পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভূয়োদর্শন লাভ করিতে করিতে "জীবনের" বেগ-মন্থর হইয়া পড়ে। যিনি তত্ত্বদর্শী—তিনি অনায়াসেই বুঝেন ব্যষ্টির জীবন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে জাতি 'জীবন' কি জানেনা, সে জাতি সর্ব্বদাই জরা-মরণ ভয়ে ভীত ও চকিত। অতএব তন্ত্রের উপদেশ—জীবনকে অক্ষুণ্ণ ও অনপচিত রাখিতে হইবে। এ সকল কথা—রস বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার "মকরধ্বজের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। আমরা 'আয়ুর্ব্বেদের উপাসক—"আয়ুর্ব্বেদ" আমাদের "জীবন মরণের "বর্ণ পরিচয়"। ইহার প্রণেতা—সর্ব্ব জীবের প্রণম্য স্বয়ং—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর। আয়ুর্ব্বেদের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—"তন্ত্র।" যিনি প্রকৃত "বৈদ্য" তিনি মনে জানে "তান্ত্রিক" না হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈদ্য, বিধাতার মতই সৃষ্টি-কুশলী। বৈদ্যের কর্ম্মক্ষেত্র—এক বিরাট পুরুষকারের দৃশ্য! পারদের আময়িক প্রয়োগ কালে, কথা গুলা কাজে লাগিবে বলিয়াই, প্রবন্ধের অবতরণিকায় ইহা বলিয়া রাখিলাম। উপেক্ষিত অবমানিত অতীতকে আমি যে রাজাধিরাজের মণি মুকুটে সাজাইতে যাইতেছি—হইতে পারে ইহা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন – চতুর ভক্তের মত, "হাটের কলায়" নৈবেদ্যের কল্পনা না করিয়া, আমি কেবল বৈকুণ্ঠনাথকেই তুষ্ট করিতে অগ্রসর! আমি ক্ষুদ্র, সুতরাং আজ আমি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহার উপলব্ধি করিবার পক্ষে—আমার এই ক্ষুদ্রতাই মহৎ অন্তরায়। যে ঋষি পারদের গুণ প্রথমেই পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন,—তাঁহার পবিত্র পদ ধূলি আমার কর্ত্তব্য-পথের অমূল্য পাথেয় হউক। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন—পারদ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বসিয়া—মুহূর্ত্তের প্রমাদে আমি যেন পুরাতনের ও পবিত্রের অবমাননা না করি।

এইবার দেখা যাউক, এদেশে ঔষধ-রূপে পারদের প্রয়োগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তদীয় হিন্দু রসায়নে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাহার অজীর্ণোদ্গার করিয়া—এ দীন প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। আমি কেবল নিজের কথাই বলিব।

বর্ত্তমানে, "সুশ্রুত সংহিতা"—আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রতিনিধি। এই সুশ্রুত সংহিতার দুই চারি স্থলে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারদ যে সর্ব্ব

ব্যাধি নিবারক মহৌষধ—সুশ্রুতের যুগে ইহা প্রচারিত হয় নাই।

সুশ্রুতের পর বাগভটের যুগ। বাগভটের সময়েও পারদ ঔষধের প্রধান উপকরণরূপে—গৃহীত হয় নাই। অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থে পারদ অর্থে রস শব্দের ব্যবহার থাকিলেও, একটী ভিন্ন রসের কোন রাসায়নিক প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গ হৃদয়—বৌদ্ধ যুগের সংহিতা। বৌদ্ধ বৈদ্যগণ—রস অর্থে রক্তের পূর্ব্বভাব বুঝিতেন। "রসক্রিয়া" তখন ঘনীভূত উদ্ভিদ রসকেই বুঝাইত।

বৌদ্ধ যুগের পর পৌরাণিক যুগ। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস—বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বেদের "পরমাত্মা" বৌদ্ধের হাতে পড়িয়া "আদিবুদ্ধ" হন। "প্রজাপতি সৃষ্টির উপাখ্যানগুলিও বৌদ্ধদের অপার মহিমায়—"বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" ও "সঙ্ঘ" এই ত্রিমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুরাণকারগণ ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধ জাতকের—ত্রিমূর্ত্তি, সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা এবং সংহার কর্ত্তা সাজিয়া—পুরাণে "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই রাসায়ণিক সংযোগ পাছে নূতন বলিয়া জনাদরের পরিবর্ত্তে অনাদর লাভ করে,—সেই জন্য শাস্ত্রকার—নূতন গ্রন্থকে "পুরাণ" আখ্যা প্রদান করেন। "পুরাণ"—পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। এহেন পুরাণের যুগেও পারদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নাই। "অগ্নি পুরাণে" বা "গরুড় পুরাণে" —যে সকল চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে পারদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংগ্রহকার গণের মধ্যে—চক্রপাণি দত্ত একজন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। মানব দেহের মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া,—অমৃতের সন্ধানে একদা তিনি অমৃতময় হইয়াছিলেন। মহাত্মা চক্রপাণিই—প্রথম পারদ ব্যবহার করেন। এ কথা প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা। চক্রপাণির পিতা "নারায়ণ" গৌড়াধিপতি নয়নপাল দেবের "মহানস রক্ষী" ছিলেন। সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দকে—তাহার প্রাদুর্ভাব কাল বলিয়া ধরা যায়। অবশ্য ইহা অনুমানেরই কথা। অনুমানে—ভ্রান্তি থাকাও বিচিত্র নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা—বিচিত্র এই—অনেক ঐতিহাসিক পারদের প্রয়োগ দেখিয়াই তন্ত্রের বয়স ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঁহাদের মতে—যখন নাগার্জ্জুন প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত সংহিতায় রস প্রয়োগের আড়ম্বর নাই, বৌদ্ধ বাগভটের গ্রন্থেও পারদের ছড়াছড়ি নাই;—তখন বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যগণ পারদ প্রয়োগের কৌশল জানিতেন না। পারদের ব্যবহার কেবল তন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়—চক্রপাণি দত্তের পরেই এদেশে তন্ত্রের সৃষ্টি।

এ গুরু গম্ভীর গবেষণাময়ী বিলাতী যুক্তি কিন্তু ঘাত-সহ নহে। আমরা—চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বৃন্দ সংহিতায় পারদের উল্লেখ দেখিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে—ভারতে তান্ত্রিকতা বর্ত্তমান ছিল। অথর্ব্বের উপচারই একদিন তান্ত্রিকতার জন্মদান করিয়া ছিল। অথর্ব্ব বেদকে পরন্তন ঋষিরা বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই অথর্ব্ববেদের সহোদর তন্ত্রকেও তাঁহারা কখনও সম্মান করিতেন না। তান্ত্রিকতার প্রতিবেশ প্রভাবই ব্রাহ্মণ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। তখন

ও তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে হৃতসর্ব্বস্ব হতগৌরব করিয়া বিজয়ী তন্ত্র স-গৌরবে দণ্ডায়মান হইলে, বৌদ্ধ দার্শনিক গণ সে আততায়িতা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা তন্ত্র ও তান্ত্রিক ঔষধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। জগতে—অ-সাম্প্রদায়িক ভাবে —কয় জন সত্যের আদর করিতে পারে? খৃষ্টান যাজক গ্রীক দর্শন ও গ্রীক বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়াছিলেন। মহামনস্বী গ্যালিলিওকেও নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার জীবন্ত-সাক্ষী। আসল ঈশ্বরকে লইয়া কখনও বিরোধ উপস্থিত হয় না; বিবাদ কেবল তোমার "ঈশা মুষা" আর আমার "দুর্গা" "হরি" লইয়া! নাগার্জ্জুন, বাগভট, প্রভৃতি বৈদ্যগণ —বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। চক্রপাণিও বৌদ্ধ-পালিত চিকিৎসক। পাছে—তান্ত্রিক ঔষধ বলিলে বৌদ্ধ প্রভু বিরক্ত হন, বৌদ্ধ মতাবলম্বী রোগিগণ—ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, বোধ হয় সেই ভয়েই যেন চরক-চতুরানন চতুর চক্রপাণি—'রস পর্প্পটী— আমারই প্রস্তুত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন! নতুবা, সাধ্যমত—বৌদ্ধ বৈদ্যগণ তান্ত্রিক ঔষধকে স্ব রচিত গ্রন্থে স্থানদান করিতে সম্মত হন নাই! চক্রপাণি—রস বিজ্ঞানের উজ্জ্বল রত্ন—রসপর্প্পটীকে স্বগ্রন্থের অধ্যায় ভুক্ত করিয়াছেন,—অথচ এমন ভাব দেখাইয়াছেন—উহা যেন তান্ত্রিক যোগ নহে, যেন তাঁহারই মৌলিক উদ্ভাবনায়, স্বাধীন চিন্তায়, আর দুর্ল্লভ সাধনায়—মহৌষধ রূপে উহা পরিকল্পিত হইয়াছে! "সুশ্রুত"—প্রতি সংস্কার কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, অষ্টাঙ্গ হৃদয়-সঙ্কলয়িতা বাগভট যে কাজ করিতে ইতঃস্ততঃ করিয়াছেন, দায়ে পড়িয়া চক্রপাণিকে সেই কার্য্যে হাত দিতে হইয়াছে! তাই "রস পর্প্পটী প্রস্তুত করিয়া, লোকলজ্জায় খাতিরে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

"রস পর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণি না।"

বৈদিক যুগে "মধু বিদ্যা" নামে স্বতন্ত্র বিদ্যার অস্তিত্ব ছিল। দধীচি ঋষি দেবরাজের নিকট এই মহতী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মধু বিদ্যাই অনেক 'হাত ফের" হইয়া, বৃহদারণ্যকে 'মধু-ব্রাহ্মণ:' নামে পরিচিত হইয়াছিল। মদ ধাতু হইতে যে "মধু" শব্দের উৎপত্তি, সে মধু আর "মদন" একই। রসজ্ঞ পাঠক পাঁচকড়ি দাদার "মদন তত্ত্ব" শীর্ষক দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় প্রবন্ধে ইহার সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। বেশী কথা বলিবার আমার সময় ও শক্তি নাই। আমি কেবল ঋগ্বেদের সেই মহাসূক্তটী উদ্ধৃত করিব—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদাসীৎ।

ইহার অর্থ—জীবের পূর্ব্ব কল্প কৃত কর্ম্ম থাকায় ভগবানের মনে সৃষ্টির কামনা জাগ্রত হইয়াছিল। সৃষ্টি ও সংহারের পরম্পরা অনন্ত; কল্পান্তরের কর্ম্ম-শৃঙ্খলাও অনন্ত। অতএব ভগবানে কাম বা মদন চির বিরাজমান। সংহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলেই, স্রষ্টার মনে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কামনাও জাগিয়া উঠে। তখন ভোগের জন্য ভগবান এক হইয়াও বহু হন। ভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা—আমরাও শক্তি গ্রহণের কালে, বিবাহের সময়—"কামঃ কামায়াদাৎ। কামেন ত্বাং প্রতি গৃহ্নামি কামৈতত্তে।" বলিয়া ভাবী পত্নীকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি।

বিজ্ঞান বলেন—পূর্ণের ধর্ম্ম অংশেও বর্ত্তমান থাকে। পরমাত্মা যেমন এক হইয়াও বহু হইতে চাহেন, জীবাত্মাও তেমনি বহুতে বিস্তৃত হইবার ইচ্ছা করে। এই "একোঽহং বহুস্যামঃ" বাসনা—তান্ত্রিকতার সূতিকা গৃহ। "মদন" সৃষ্টিকর্ত্তার নিত্য সহচর। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং মদন যেমন পরমাত্মার নিত্য সঙ্গী, তেমনি জীবাত্মারও নিত্য সঙ্গী। তন্ত্র অতি সংক্ষেপে ইহার আভাষ দিয়াছেন। তন্ত্রের মতে শিব ও জীব এক। শিবের "মদন" সৃষ্টির বিকাশে ও বিস্তারে পরিস্ফুট; জীবের "মদন" দেহ বদ্ধ রিরংসায় পর্য্যবসিত। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—বহুতে পরিণতি, অংশে অংশে বিস্তৃতি।

এই বহুতে পরিণতির জন্য যে আনন্দের আদান প্রদান—তাহার নাম "যৌবন।" তন্ত্র বুঝিয়াছিলেন—যৌবনের অরুণ রাগে লোহিতাভ হইয়া পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের হিল্লোলে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছেন! সে কম্পনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হইতেছে। ইহার পরই উভয়ের "একী করণ"—অৰ্দ্ধনারীশ্বরের চিত্র—তাহার তত্ত্বময় রূপক। পৃথিবীতে, স্থাবর জঙ্গম, স্থূল সূক্ষ্ম, জড়, শক্তি যাহা কিছুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত পদার্থই এক হইতে বহু হইতে চাহে। "মদন" এই আত্ম বিসর্পণের নেতা, সেই মদনের যে অধিনায়ক—তাহারই নাম "যৌবন"। সৃষ্টির সনাতন ধারা রক্ষা করিতে হইলে—"যৌবনকে" অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। "যৌবন"—আত্ম বিকাশের একমাত্র অবলম্বন। বহু হইবার যে সাধ—তাহার নাম "রস"। তাই আর্য্য ঋষি 'তত্ত্বমসি" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"; তিনি "রস" স্বরূপ। "রস" ভিন্ন বহুতে পরিণতি ঘটে না! "রস" নহিলে 'দুই' 'এক' হইতে পারে না; 'রস' ছাড়া আমার আমিত্বকে বহু বিসর্পিত করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। "রসের" আধার—"যৌবন"। "রসের" ইংরাজী প্রতি শব্দ স্থির করিবার মত প্রতিভা আমার নাই। তবে আমার অনুমান—"Emotions" কথাটার "রস" বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। যাহার দ্বারা আমার 'আমিত্বের' বিসর্পণ ও সংহরণ সম্ভব পর হয়—তাহাই "রস"। এই "রসেরই" এক একটী তরঙ্গ—রতি, আসক্তি অনুভূতি। রসের আধার "যৌবন," যৌবনের বেদী—"রূপ।" জগতে সকলেই চায়—তৃপ্তি; এই তৃপ্তির পথের যাহা অন্তরায়, তাহার নাম "দুঃখ"; এ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের যে বিরাট প্রয়াস—তাহাই জীবের "সাধনা"। তান্ত্রিক সাধক নৈশ "সাধনায়" আত্ম নিয়োগ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সৃষ্টি ধারা বজায় রাখিতে গেলে—স্বাস্থ্য সামর্থ্যে সমুজ্জ্বল শরীর চাই; তেমন শরীর না হইলে "যৌবন" স্থির থাকিতে পারে না,—"রস"ও পরিস্ফুট হয় না। যে ইচ্ছায় "মদনের" উদ্ভব, সেই ইচ্ছায় "রসের"ও বিকাশ; তান্ত্রিক তাই অনন্ত দুঃখের উপশান্তি কামনায়—তৃষাক্ষাম কণ্ঠে "রসের সাগরে" ডুব দিলেন। আত্মার মোদিনী ও রঞ্জিনী বৃত্তিকে "রস" সিক্ত করিয়া লইলেন। শেষে—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বাসনা ব্যাপ্ত যৌবন এবং আনন্দময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য, ধরণীর অন্ধ-তামস গর্ভ হইতে রুদ্রমূর্ত্তি "রসের" আবিষ্কার করিয়া, তান্ত্রিক নিজে ধন্য হইলেন, আমাদিগকেও কৃতার্থ করিলেন। বলা বাহুল্য এই রস বিজ্ঞানের বিচিত্র মায়া

বুঝিবার নিমিত্ত তান্ত্রিককে "বিলাস" ছাড়িয়া "বিকাশ"কে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল!

মানুষকে কোন তত্ত্ব শিখাইতে হইলে, ভগবানকেও মানুষ সাজিতে হয়, মানব-ভাষায় কথা কহিতে হয়! যে দেশ দশ দশ বার ভগবানের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে—সে দেশের লোক ভিন্ন—অন্য দেশের লোক আমার এই কথা গুলিকে হাস্যাস্পদ বাচালতা মনে করিতে পারেন। কেননা তন্ত্রের কথা আমাদের চেয়ে কেহই বোধ হয় ভাল বুঝিবে না। ভারতের বিজ্ঞান ছাড়া—পারদের এই বিরাট বিশ্লেষ তত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির বিজ্ঞানে আছে কিনা জানি না। তন্ত্র—শিব বাক্য। ইহার অন্য সংজ্ঞা—"আগম"। তন্ত্র যিনিই লিখুন বা যাঁহারাই লিখুন—তাঁহারা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে গরিষ্ঠ, প্রতিভায় অতি মানুষ, অধ্যবসায়ে অক্লান্ত কর্ম্মী—কর্ম্ম বীর ছিলেন—ইহা আমাকে বলিতেই হইবে। আমরা মানুষ, আমাদের জীবন অনন্তে "মুহূর্ত্ত" মাত্র। এই মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল—যে ভাগ্যবান—দেবতার সঙ্গে, দেবতার কার্য্যে, দেবতার কৃপায় যাপন করিতে পারেন; যিনি ধরণীর চ'ক্ষে জন্ম হারাইয়া, সত্যের চ'ক্ষে অমর হইতে পারেন, তিনিই "রসশালায়" প্রবেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। অন্যের সে অধিকার নাই। অতএব দূর হইতেই "তস্মৈ রসায় নমঃ" বলিয়া আমরা পারদের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"রসের" নাম "পারদ" হইল কেন? তন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। যে ধাতু মানুষকে জন্মমৃত্যুর পরপারে লইয়া যায়—"পারদ"ই তাহার সার্থক সংজ্ঞা। পারদ সেবনে মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে—তাই পারদের একটী বিশেষণ—"সূত"। পারদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য—"রসেশ্বর দর্শন" সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেই রসেশ্বর দর্শনের সূচনা এইরূপ—

উর্দ্ধে - মুক্ত উদার বিপুল নীলিমা, নিম্নে শ্যামল তৃণ প্রান্তর; সম্মুখে—আবেগ চঞ্চলা কলনাদিনী নির্ঝরিণী, পশ্চাতে - লতার শ্যাম বেষ্টনে—গগনস্পর্শি নমেরু তরু; মধ্যে—মায়ালোক মধুর শৈল শিখর। চারিদিকে অসীম মৌনতা। তন্দ্রা-মগ্ন নিশীথে—বিল্ব কুঞ্জের মর্ম্মর বেদীতে—মহাযোগী মহাদেব। তাঁহার বামে—সাধনার সহচরী মহামায়া। পার্ব্বতী পশুপতিকে প্রশ্ন করিলেন—"প্রভো! কি উপায়ে মানুষ খেচরী গতি লাভ করিতে পারে?" শঙ্কর সহাস্য মুখে উত্তর দিলেন—"রসের প্রয়োগে।" পাঠক! দেবতার কথা দেবতার ভাষাতেই শুনুন;—

"যথা লোহে তথা দেহে কর্ত্তব্যঃ সূতকঃ সদা।
সমানং কুরুতে দেবি! প্রত্যয়ং দেহ লোহয়োঃ।
পূর্ব্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রয়োজয়েৎ।"

লোকনাথ লোকধাত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন—"প্রথমে ধাতুর উপর, পরে দেহের উপর—পারদের প্রভাব পরীক্ষা করা উচিত। পারদ ব্যবহারে জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।" বরাহ মিহিরের সময়েও—ব্যাধি বিনাশের জন্য—"মাক্ষিক ধাতু মধু পারদ চূর্ণ" সেবনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিকগণ পারদের নিন্দা সহিতে পারিতেন না। তান্ত্রিকের প্রাণের কথা—

পতিতো দরদে দেশে গৌরবাদ্বহ্নি বক্ত্রতঃ।
সুরসো ভূতলে লীন স্তত্তদ্দেশ নিবাসিনঃ।
যশ্চ নিন্দতি সুতেন্দ্রং শম্ভোস্তেজঃ পরাৎপরং।
স পতেন্নরকে ঘোরে যাবৎ কল্প বিকল্পনা॥

রস রত্ন সমুচ্চয়। ১ম অঃ।

হরবীর্য্য পারদ বহ্নি দেবতার মুখ হইতে দরদ দেশে পতিত হইয়াছিল; এ হেন সুতেন্দ্রকে যে অধম নিন্দা করে, সে দেব নিন্দা রূপ মহাপাপে কলুষিত হইয়া কল্লান্তর কাল-নরকে বাস করে। বাস্তবিক পারদের উপকারিতা দেখিলে "পারদকে" দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। "পারদ"—ভাব প্রধান ভারতবর্ষের চিরন্তনী সম্পত্তি। মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় সাধনে—পারদ এই জম্বু দ্বীপের ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পারদের গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মান-দণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। পারদ প্রকৃতির পরম ও চরম প্রমাদ। মানবের দেহ-ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ। কেবল মাত্র—পারদের সাত্ম্য-সামগ্রী দিয়াই বৈদ্য সে ক্ষতির পূরণ করিতে পারেন। পারদের প্রকৃত প্রয়োগ করিতে পারিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক,—বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্য-মিথ্যার সমুদ্র-মন্থনে, —পারদের উত্থান; হিন্দু একদিন এই পারদের অমৃত আস্বাদ উপভোগ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুর নির্জীব বিজ্ঞানের শান্ত ক্রোড়ে —শিবকণ্ঠের মৃত্যু নীলিমার মত পারদের কল্যাণকর চিহ্ন বর্ত্তমান। বৈদ্যগণ—এখনও পারদের সাহায্যে—অসাধ্য-ব্যাধি জয় করিয়া থাকেন। পারদের প্রভাবেই এখনও জীর্ণ-জটিল রোগে—বৈদ্য চিকিৎসার মত সফল চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পারদ হিন্দুর স্মৃতি সর্ব্বস্ব অতীতের স্মারক,—বর্ত্তমানের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান, ভবিষ্যতের স্বর্ণ মণ্ডিত বিজয় স্তম্ভ। প্রকৃত সাধকের অনুশীলনের অভাবে—আলোক বিহীন স্থানের উদ্ভিদের মত, পারদের মহিয়সী শক্তি—এখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে! তন্ত্রের "ভৈরবী চক্র" কামনায় কলুষিত হইয়াছে! বৈদ্য-সমাজে আর অনুসন্ধানতৎপরতা দেখিতে পাই না! রসানুভাবকতার জ্বলন্ত মূষা—ইন্ধনের অভাবে নিভিয়া গিয়াছে! তান্ত্রিকের বংশধর নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ভুলিয়াছে। এ পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তও এইবার আরম্ভ হইয়াছে! হাটে মাঠে ঘাটে বাটে—মুদীর দোকানে, পশারীর টাটে—শঠতার জয়চিহ্ন সস্তায় "চ্যবন প্রাশ" বিক্রয় হইতেছে! বৈদ্যের "বত্রিশ সিংহাসনে" বসিয়া—"ভোজের" মত নগণ্য ব্যক্তিও সুধার দোহাই দিয়া, জঘন্য বিষ প্রয়োগে অগণ্য নরনারীকে প্রতারণা করিতেছে! "মকরধ্বজের" নামে—পারা গন্ধক ও মনছালের সংযোগ—নীরিহ লোককে ব্যাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে! আজ যে "তামাক ওয়ালা"—কাল সে "কবিরাজ" সাজিতেছে! "পাচনের" পবিত্র উপাধি লইয়া হাতুড়ের হাতধোয়া জল—দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হইয়াছে! নিজের জাতিকে ইন্দ্রিয় লালসার অন্ধ উন্মাদনায়—আকুল করিবার জন্য—"পানের দোকানে" দুই পয়সায় 'মদনানন্দ মোদকের' নমুনা বিকাইতেছে।

অতীতের অযত্ন ও অমর্য্যাদায় ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম! আমি "আয়ুর্ব্বেদের" একজন লেখক, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া আমার কোন নিবন্ধ আয়ুর্ব্বেদের পদপ্রান্তে স্থান পায় নাই। এজন্য অনেকেই আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। কেহ কেহ আমার রচনা অতিরিক্ত সদয়-দৃষ্টিতে দেখিয়া,—আমি আর লিখিনা কেন? —পত্র লিখিয়া জানিতেও চাহিয়াছেন। এত-

দিন আমি কাহাকেও পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। কেবল—আমার দুঃখের সহৃদয় শ্রোতা —সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়কে আমার মর্ম্ম-বেদনা কথঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের কথা আমার "কৃষ্ণ কথা," কিন্তু সে কথা কাহাকে শুনাইব? আমি যে—"ধুঁয়ার ছলনা ক'রে কাঁদি"—কে ইহা বুঝিবে? বেদ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আমি যে কেবল শ্মশান ভস্মে সোণার কমণ্ডলু ভাবিয়াছি। তবে আর লিখিব কি? আয়ুর্ব্বেদের যজ্ঞমণ্ডপে—আজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ প্রবেশ করিয়াছেন: আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। তাই অযোগ্য হইয়াও—আজ আবার ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণে সাহসী হইয়াছি। আমার আকুল কণ্ঠের একাগ্র প্রার্থনা—এতদিন মহাশূন্যে বিলীন হইয়াছে। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে বৈদ্যরত্ন গণনাথ! হে কবিরাজ-কুল ভূষণ যামিনী ভূষণ! বলিতে পার—তোমরা থাকিতে, এখনও ৩৫ খানি সংহিতা থাকিতে, বাঙ্গালীর "গুড় খেগো মিষ্ট মুখ"—কুইনাইনে এমন 'তিত' হইয়া গেল কেন? যে দেশের মাটীতে এখনও পল্‌তা ক্ষেৎপাঁপড়া প্রমুখ শত তিক্ত জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সে দেশে কে কুইনাইনের "কল্পতরু" রোপণ করিল? "আয়ুর্ব্বেদকে" পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব প্রদান করিবার জন্য দেশে কি আর একজনও "বৈদ্য" দেখিতে পাইব না? যে দেশে হারীত, অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুতের সত্ত্বা বিরাজ করিত সে দেশে কি আর দ্বিতীয় "গঙ্গাধর" জন্মগ্রহণ করিবে না? কৈ সে "নরনারায়ণ"—যিনি প্রলয়পয়োধি জলে —"আয়ুর্ব্বেদকে—" পৃষ্ঠে বহন করিতেন? সভ্যতার জীবন্ত কেন্দ্র কলিকাতা সহরে —আজকাল "কবিরাজের" অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই গুরু নাই, সতীর্থ নাই! যিনি "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক তিনি "ব্রহ্ম"—তাঁহার একটী বিশেষণ "স্বয়ম্ভূ"; এই সকল "কবিরাজ"ও স্বয়ম্ভূ (অর্থাৎ আপনা হইতে জন্মিয়াছেন—বাংলা ভাষায় যাহাকে ভূই ফোঁড়" বলে)—ইহাই কি বৈদ্য বিজ্ঞানের বিবর্ত্তণ-বাদ? মোহপ্রাপ্ত মাতৃদেহ ইহারা যে শ্মশানে টানিয়া আনিয়াছে;—ভদ্রাসনের কড়ী বরগা চেলাইয়া চিতা সাজাইয়াছে, —তাহাতে মাতৃদেহ তুলিয়া দিয়া, বিলাতী দেশলাই ধরাইয়া আগুণ জ্বালিতেছে; সে আগুণে মৃত্যুগন্ধি ধূম ও রক্তনাগিণী শিখা উঠিতেছে! ক্রব্যাদ-বহ্নির প্রেতালোক দেখিয়া, যমাষ্টকের সান্নিপাতিক সন্তাপে উন্মত্ত হইয়া, দেশের লোক কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া—চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে! পার যদি—ইহার প্রতিকার কর। অমঙ্গলের চিতাচুল্লী হইতে মাতৃমূর্ত্তি নামাইয়া লও। তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া—কালী-ধূম মুছাইয়া 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের" নর্ম্ম বেদিকায় বসাও। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—নিপুণ বৈদ্য-হস্তের হরি চন্দনে লিপ্ত কর। জীবন্ত আয়ুর্ব্বেদের জীবনীর স্নেহে—সে দাহস্ফোট শীতল হউক।

তন্ত্রের মহিমা ও পারদের কথা বলিতে গিয়া—অনেক বাজে কথাই বলিলাম। আমার ভগ্ন কণ্ঠের কর্কশ কাকু—অনেকের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এই খানেই—আজ এই "ঢাকের বাদ্যি" বন্ধ করিলাম।

শিশুপালন।

(পরিপাক ক্রিয়া।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—:*:—

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী।]

খাদ্যের কার্য্য কি কি ?

খাদ্য (১) আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলশালী এবং গঠন করিবার পক্ষে খাদ্যই প্রধান উপায়। দেহের বৃদ্ধির পক্ষে খাদ্য প্রধান উপাদান। (২) সমগ্র জীবন ভরিয়া ক্রমাগত আমাদের দেহ যে ক্ষয় হইতেছে খাদ্য তাহা পূরণ করে। (৩) দেহে উত্তাপ এবং শক্তিসঞ্চার করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়—খাদ্য তাহা প্রদান করে।

এই কাজগুলি করিতে গেলে খাদ্যকে রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। কিরূপে খাদ্য—রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এখানে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করে, এমন কি যে মাতৃদুগ্ধ পান করে তাহা কিরূপে রক্তে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা শিশুর হাড়, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতিইবা কিরূপে গঠিত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জননীই উৎসুক হইতে পারেন।

আহার্য্য দ্রব্য কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিপাক হইয়া এমন সব দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় যে, তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

শিশু শুধু দুগ্ধ পান করে বলিয়া তাহার পরিপাক প্রণালী সহজ ও সরল এবং পরিপাক যন্ত্রও অত্যন্ত কোমল থাকে। এই কারণে শিশুর খাদ্যের কোনরূপ গোলমাল হইলে সহজেই পরিপাক যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে এবং নানারূপ অসুখ হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্যের জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, পরিপাক যন্ত্রও তেমনি দৃঢ় হইতে থাকে এবং পরিপাক করিবার ক্ষমতাও বাড়ে।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে যাইবামাত্র আমরা তাহা জিহ্বা এবং দাঁত দিয়া চর্ব্বণ করি। তারপর আমাদের আহার্য্যে যে শ্বেতসার পদার্থ আছে—(প্রধানতঃ, ভাত, আলু, শাকসজী প্রভৃতিতেই বেশী পরিমাণে শ্বেতসার পদার্থ থাকে)—তাহা লালা রস দ্বারা maltose নামক একপ্রকার দ্রবণীয় পদার্থে (শর্করায়) পরিণত হয়।* শ্বেতসার পদার্থ জলে মিশ্রিত করা যায় না,

* আমাদের মুখের ভিতর প্রধানতঃ তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে, তাহা হইতেই লালারস নিঃসৃত হয়। এক জোড়া গ্রন্থি কাণের ঠিক নীচে এবং সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে, আর দুই জোড়া মুখের ভিতরে রহিয়াছে। প্রত্যেক লালাগ্রন্থি হইতে একটি ছোট নল বাহির হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নল দিয়া লালারস প্রবাহিত হইয়া মুখের মধ্যে আসে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মুখের মধ্যে আরো ছোট ছোট লালা গ্রন্থি আছে। লালা রস alkaline। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ, মেদময় পদার্থ এবং মুখের ত্বক হইতে নিঃসৃত আরো কয়েক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাতে দেহের অন্যান্য সমস্ত রস হইতে পৃথক একটি বিশেষ পদার্থ আছে, তাহার নাম Istyalin। লালা রসের ইহাই প্রধান উপকরণ এই Istyalinই শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করে। শিশুদের ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বে তাহাদের লালারসে এই পদার্থ উপযুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকেনা বলিয়া তাহারা শ্বেতসার বিশিষ্টখাদ্য শর্করায় পরিণত করিতে অর্থাৎ জীর্ণ করিতে পারে না।

সুতরাং রক্তের সহিত কিরূপে মিশিবে? কিন্তু লালারস দ্বারা ইহা-যে দ্রবণীয় শর্করা পদার্থে পরিণত হয় তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে যে লালারস নির্গত হয় তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। মাতার দুগ্ধে শ্বেতসার কিংবা তদনুরূপ কোনো পদার্থ বিদ্যমান নাই।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে চর্ব্বিত এবং তাহার শ্বেতসার পদার্থ লালারস দ্বারা শর্করায় পরিণত হইবার পর তাহা গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর ভিতরের গতি একপ্রকার সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবৃত। এই ত্বক হইতে রক্ত হইতে জাত এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়, তাহার নাম পাচক রস। খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে পর ইহার পেশী নির্ম্মিত গাত্র খাদ্য দ্রব্যকে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর ত্বক হইতে নিঃসৃত পাচক রসের সহিত খাদ্য দ্রব্য একবারে মিশ্রিত হইয়া যায়। (ক) মুখের লালারস আমাদের খাদ্যদ্রব্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে। এই সমুদয় পদার্থ পাচক রস দ্বারা Proteid matters পেপটোন নামক এক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। শিশুর দুগ্ধপানের পর তাহা এই পাকস্থলীতে আসিয়া অম্লাদি বিশিষ্ট পাচকরসের সহিত মিশিয়া দুগ্ধের ছানার অংশ পৃথক হইয়া পড়ে। এই ছানাই দুগ্ধের nitrogenous পদার্থ। পাচকরস তখন এই ছানাকে জীর্ণ করে। মাতৃদুগ্ধের ছানা খুব ছোট ছোট হয়, সুতরাং পাচক রস তাহা সহজেই হজম করিয়া দেয়. কিন্তু গরু ও ছাগলের দুধের ছানা ভারি এবং গাঢ় হয়, এই জন্য হজম হইতে দেরী হয়। গাধার দুধ অনেকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়, সুতরাং হজমও শীঘ্র হয়। খাদ্যের ছানার অংশ পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা পেপটোন নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীর গাত্রে যে অসংখ্য সূক্ষ্মরক্তবহা নালী Blood vessels আছে তাহাতে চলিয়া যায়। খাদ্যের অবশিষ্ট যে সব অংশ (যেমন মেদময় পদার্থ, শেতসার পদার্থ) পাকস্থলীতে দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থলে যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে ক্লোমরস (Pancreatic Juice) আসিয়া খাদ্যের উপর কার্য্য করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে (Pancreas) ক্লোমরস আসিবার Jotyalin যেমন লালারসের প্রধান উপকরণ, Joepsin তেমনি পাচক রসের প্রধান উপকরণ। পাচক রস মেদময় পদার্থ এবং শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিতে পারে না। ক্লোমরস ইহাদিগকে জীর্ণ করে। পাচক রস nitrogenous খাদ্যকে জীর্ণ করে। মাংসের albumen, ডিমের খাদ্য অংশ, দুগ্ধের ছানা (casim) ময়দার gluten প্রভৃতি পাকস্থলীতে পাচক রস জীর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত দুইটি নালিযুক্ত পাকস্থলীতে পাচক রসের কার্য্যের পরও খাদ্যের যে সব উপাদান অপরিবর্ত্তিত

(ক) পাচক রসের গুণ acid। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ free hydrocitric acid এবং pepsin আছে।